হেমানগর

সুশীল জানা

বুক ওয়ার্ল্ড
লিমিটেড
কলিকাতা-১

বুক ওয়ার্ল্ড লিঃ

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৬

প্রকাশক : সচ্চিদানন্দ সেনমজুমদার

৫ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা—১

মুদ্রাকর : কানাই লাল দে

বি, জি, প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ

৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদশিল্পী—ও, সি, গাঙ্গুলি

মুদ্রণ : নিউ গয়া আর্ট প্রেস

ব্লকনির্ম্মাণ : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

বাঁধাই—হার্টসন এণ্ড কোং

আড়াই টাকা

গ্রাম নগরের শহিদদের
উদ্দেশে

হাট

ক্যানেলের ধার ঘেঁষে গুটিকয়েক বুড়ো বট আর অশত্থের ছায়ায় হাট বসে। সপ্তাহে মাত্র দু-দিন হাট। বাকী পাঁচটা দিন গ্রামের মানুষ বড় একটা কেউ পা বাড়ায় না এদিকে। সে-কটা দিন লোকালয়-বিচ্ছিন্ন জনহীন জায়গাটা নির্জনতায় ঝিম মেরে থাকে। একটা শূন্য চালানী নৌকো হাটের কাছাকাছি ক্যানেল পাড়ে নোঙর ফেলে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে কাশবনের ভেতরে। সেইখানে শুধু তিনটি মানুষের গলা শোনা যায়। তারা রাঁধে, কাঠ চেলা করে, নৌকো ধোয়। কখনো কখনো একটি গলা গান গেয়ে ওঠে। অধিকাংশ সময়েই চুপচাপ। তিনটি মানুষ একেবারে চুপচাপ বসে জাল বোনে একান্তমনে। একটি বুড়োটে শুকনো মানুষ—কড়াপাক শণের দড়ির মতো। সে হলো মাঝি বৈরাগী দাস। আর দুজন দাঁড়ি—ভবানী আর কেদার, জোয়ান ছোকরা। এদের তিন জনকেই চারিদিকের জনমানবহীন নীরবতা যেন গ্রাস করে ফেলেছে সম্পূর্ণভাবে। ক্যানেলের পাশ থেকেই স্বরু হয়েছে দিগন্তবিসারী মাঠ—গ্রামগুলি দূরে দূরে। অথৈ নির্জনতার এ এক বিস্তীর্ণ রাজ্য। পরস্পরের মধ্যে লোক তিনটি যেন কথাও বলে কম। সপ্তাহে বার দুই যায় গঞ্জের

হাটে মাল আনতে। কনট্রোলের চিনি, কেরোসিন আর বেনেতি মসলা, গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসে নৌকো বোঝাই করে, কখনো গ্রাম দেশ থেকে নিয়ে যায় পাট আর কুমড়োর চালান। দিনের পর দিন কাটে নৌকোতেই—নৌকো এদের ঘর-সংসার। ভাসন্ত ঘর। সে ঘরের ওপরে সিঁদুর দিয়ে নাম লেখা : মালিক—শ্রীসদাশিব হাজরা।

সদাশিব নিজে এসে দেখে যায় মাঝে মাঝে—নৌকোর তোয়াজ তদারক ঠিক চলছে কিনা, দাঁড়ি-মাঝি সব ঠিক আছে কি-না। সবই প্রায় ঠিক থাকে। একটা লোক শুধু উধাও হয়ে যায় মাঝে মাঝে। সে হলো কেদার। হঠাৎ কোনো কোনো দিন সন্ধ্যের পর তার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। কবে যে সে এমনি যাবে—শুধু মাঝি বৈরাগী দাস তা আগে থেকে বুঝতে পারে। কেদার সেদিন গান ধরে দেবে হঠাৎ—জনহীন প্রান্তরে শব্দের ক্ষ্যাপা তরঙ্গ উঠে নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দেবে। উসখুস করবে ডাঙায় আর নৌকোয়। মুখ-চোখে চাপা অস্বস্তি। তারপর কারুকে কিছু না বলে বোঁ করে বেরিয়ে পড়বে হাজারো ভাঁজধরা একটা হাফশার্ট গায়ে দিয়ে। মাঝি খুক্ খুক্ করে কেশে বিড় বিড় করে বলবে—'শালা মরতে গেল।'

ভোরেই আবার ফিরে আসবে কেদার—চোখমুখ বসা, গায়ে ভুর ভুর করবে তাড়ির গন্ধ। মাঝি বিড় বিড় করে তাকে সম্ভাষণ জানাবে আবার—'শালা মরে এলো।' কিন্তু কেদার যেন বেঁচে ওঠে তারপর। হঠাৎ এক-একটা হাসি চাবুক মারে যেন জনহীন প্রান্তরে, মাঝির গালবসা তোবড়া আশা আশ্বাসহীন মড়ার মতো খটায়। কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিন। আবার জনহীন প্রান্তরের

শব্দহীন শূন্যতা ঘন হয়ে আসে কাশবনের ছায়ায়। কেদার ঝিমিয়ে পড়ে।

এমনি একটা ঝিমনোর কাল চলছিল কেদারের। তিনজনেই জাল বুনছিল এক মনে। কেদার হঠাৎ হাতের জালটাকে ফেলে দিয়ে সোজা চিত হয়ে শুয়ে পড়লো নৌকোর ওপরে। একটা আড়মোড়া ভেঙে বললো, 'তুত্তোর শালার—ভালো লাগে না।'

মাঝি আড়চোখে তার দিকে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'এঃই—মরেছে।'

ভবানী হি-হি করে হেসে উঠলো।

কেদার চোখ বুজে পড়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর উঠে তার কাঠের বাক্স খুলে হাফশার্টটা টেনে বার করলো।

মাঝি বলে উঠলো, 'সন্ঝের পরে মাল বোঝাই হবে লৌকায়—আজ রাত্রেই চালান যাবে। কর্তা বলে পাঠিয়েছে।'

'নূতন কথা শোনাচ্ছ মোকে!' মাঝির কথা উড়িয়ে দিয়ে কেদার হেসে বললো। 'সন্ঝের পরে কবে আবার মাল পড়ে লৌকায়?'

মাঝি বললো, 'কর্তা বলে পাঠিয়েছে—আমিও জানিয়ে দিলাম। বাস।'

ভবানী মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তার দিকে চেয়ে কেদার বললো, 'সত্যি বল স্যাঙাৎ—রাত্রেই আজ চালান যাবে?'

'যাবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি ভাবলো কেদার। তারপর টেনে জামাটা গায়ে দিল। বললো, 'বেশ। এসে পড়বো ঠিক সময়ে। ভালো লাগে না শালার।'

বলতে বলতে নৌকো থেকে লাফ দিয়ে কেদার ক্যানেল পাড়ে গিয়ে উঠলো।

ভবানী হি হি করে হাসতে হাসতে বললো, 'স্যাঙাৎ যে চললো গো মাঝি।'

মাঝি আর সেদিকে তাকায় না। তবু জাল বুনতে বুনতে সব যেন গোলমাল হয়ে যায়, বুড়োটে শুকনো হাত দুটো কাঁপে ঠক্ ঠক্ করে—তোব্ড়া মুখটা আরও তোবড়া দেখায়। কিছুক্ষণ বাদে চোখ তুলে দেখে—কেদারকে আর দেখা যাচ্ছে না। অমনি লাফ দিয়ে ডাঙায় গিয়ে ওঠে। অদ্ভুত এক কৌতূহলে কাশবনের আড়াল থেকে উঁকি মারে। কেদার যখন একেবারে চোখের আড়াল হয়ে যায় তখন ফিরে আসে নৌকোয়—অস্থিরভাবে পায়চারি করে নৌকো থেকে ডাঙায়। মনে হয়—সেও হঠাৎ কেদারের মতো ক্ষেপে চলে যাবে এই ভাসন্ত ঘরটা ছেড়ে। কিন্তু ভবানী জানে, মাঝি যাবে না। তাকে কোনদিন কোথাও যেতে দেখেনি। শুধু ছটফট করবে সে এমনি—কেদার যেদিন যাবে। সারা রাত ঘুমোবে না লোকটা। প্রথমটায় অদ্ভুত লাগতো—এখন সবটা গা সওয়া হয়ে গেছে ভবানীর।

ভবানী একমনে জাল বুনছিল। একবার চোখ তুলে দেখলো, মাঝি মুখে চোখে মাথায় জল দিয়ে নৌকোর পেছনে গিয়ে গুম হয়ে বসে আছে। ভবানী বললো, 'স্যাঙাৎ কিন্তু ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ঘরবাড়ি যায় না। দেখছি তো ক-মাস—কাজে ফাঁকি নাই। তবে ওই যা এক-আধ দিন।'—বলে সে মুচকি হাসলো।

'ঘর যাবে! ঘর শালার যমালয়ে।' ক্রুদ্ধ আক্রোশে কথা বলে মাঝি। বললো, 'ই শালা এই লাইনের দোষ—ঘর থাকতে নাই। তুই

নুতন ঢুকেছিস—বুঝবি কিছুদিন পরে। তোকে ঢুকিয়েছে এ কাজে ওই শালা ক্যাদার, তোর দফাও রফা।'

কথাটা সত্যি। ভবানী তাই চুপ করে রইলো। কেদারই তাকে ঢুকিয়েছে এই কাজে। কেদার লোকটার ঘর এ অঞ্চলে নয়—উত্তর অঞ্চলে। এখান থেকে ক্রোশ দশেক দূরে। তবু তার সঙ্গে জানা-শোনা বহুদিনের। কেদারের তখন নিজের নৌকো ছিল—ছোট হাটুরে নৌকো; আর ভবানীর ছিল চাষ-বাস, সেই সঙ্গে ছোটখাট একটি তামাকের দোকান। গঞ্জের হাটে যেত তামাক পাতা আর চিটেগুড় আনতে, কখনো তে-খালির ধানকলে গিয়ে ধান বেচে আসতো চড়া দামে। তখন কেদারের নৌকোতেই যাওয়া-আসা করতো ভবানী। তখন থেকেই তাদের স্যাঙাৎ পাতানো। তারপর হঠাৎ একদিন দেখাশোনার পথ বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ লেগে গেল—জাপান হানা দিল বাঙলার সীমান্তে। সমুদ্রের পাশ-ঘেঁষা জেলা—জেলে ডিঙি থেকে সুরু করে হাজার দু-হাজার মনি কিস্তি যা ছিল—জরুরি সামরিক কারণে সব কেড়ে নিল গবর্নমেণ্ট। তারপর গেছে সমুদ্রের লোনা বান, দুর্ভিক্ষ। বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন দেখা দু-জনে—এই হাটে।

কেদারই ছুটে এসে চেপে ধরেছিল ভবানীর হাত, 'স্যাঙাৎ!'

'তুমি এখানে!' ভবানী জিজ্ঞেস করেছিল, 'লৌকা লিয়ে এসেছ বুঝি।'

'লৌকা!' কেদার ম্লান হেসে বলেছিল, 'মোর লৌকা গেছে সেই যুদ্ধের সময়ে। মোর অতবড় লৌকা লিয়ে পরে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল পনর টাকা শালারা—তাতে দু-খানা তক্তাও হয় না। তারপর ঘুরতে ঘুরতে

এসে পড়েছি সদাশিব হাজরার নৌকায়। যাক্‌—আবার নূতন করে নিজের নৌকা বাঁধবো স্যাঙাৎ, হাতে যতদিন জোর আছে, এ আমি বলে দিলাম।' হেসে বলেছিল, 'আর সেই নৌকায় চড়ে তুমি আবার যাবে ধান বেচতে, তামাক পাতা আর চিটা আনতে।'

ভবানী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'মোর আর দোকান নাই স্যাঙাৎ—ধান বেচতে যাওয়াও শেষ হয়ে গেছে জন্মের মতো।'

'সে কি গো স্যাঙাৎ!'

'বন্যা গেল, দুর্ভিক্ষ গেল। জানই তো।'—

পাঁচ বছরে একটা ওলট পালট করা ঝড় বয়ে গেছে। সেই সব কথাই বলেছিল কেদারকে ভবানী। শেষে বলেছিল, 'সব গেছে ওই সদাশিবের ঘরে। এখন মজুর খাটি—খাই।'

তারপর সেই সদাশিব নতুন পাঁচশ' মণি কিস্তি ভাসিয়ে দিয়েছে জলে—দুর্ভিক্ষের পরে এ অঞ্চলে প্রথম। জোর চলেছে চালানি কারবার। একটিমাত্র নৌকো।

ভবানী ম্লান হেসে বলেছিল, 'স্যাঙাতের তবু দেখা পাওয়া গেল সদাশিবের দয়ায়। ঘুরে ঘুরে দেখা হয়ে গেল।'

'তোমার গেছে জমি, কারবার—মোর গেছে নৌকা,' কেদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল। 'যাক শালার—আবার হবে। আমি বলি, তুমি দাঁড়ির কাজে মোর সঙ্গে এসে লেগে যাও স্যাঙাৎ। তারপর দু-জনে খেটেখুটে টাকা জমিয়ে এক সঙ্গে নৌকা বাঁধবো। তুমি যদি সঙ্গে থাক তবে আরও জোর পাই স্যাঙাৎ। আসবে? বল?'

কথাটা সেদিন মনে ধরেছিল ভবানীর: নিজের নৌকো—নিজের ব্যবসা। আবার নতুন জীবনের মোহ।

কিন্তু মাঝির কাছে সেই সব পুরাণো আশা আশ্বাসের কথা বলতেই সে হেসে উঠলো। বললো, 'আমিও আজ দশ বচ্ছর নৌকা বাঁধছি। তুইও বাঁধবি ক্যাদারের সঙ্গে। ক্যাদার শালা আর ক-দিন বাঁচবে? যারা গুণ টানে তারা বেশী দিন বাঁচে না।'

ভবানী আর কোনো কথা বলে না। মাঝি লোকটা অত্যন্ত নির্মম ভাবে তার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়; লোকটার সামনে বসে থাকতে ভালো লাগে না আর। নৌকো থেকে ক্যানেল পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় চুপ করে। তারপর গুটি গুটি সে এগোয় গ্রামের দিকে—ঘরের দিকে। মনে মনে ঘোরে মাঝির কথা: এ লাইনে ঘর থাকতে নেই। কিন্তু কেন? প্রশ্নের জবাব সে খুঁজে পায় না। শুধু ভাবে, কেদারের মুখে কোনোদিন সে ঘরের কথা শোনেনি, মাঝিরও না। হয়তো ওদের কেউ নেই। তার মা আছে, ভাই-বোন আছে। গঞ্জের হাটে চালান নিয়ে যাওয়ার আগে একবার দেখা করে আসতে চলল সে।

সন্ধ্যের পরে সুরু হলো মাল বোঝাই। গ্রাম থেকে একটা খাল এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এসে ক্যানেলে পড়েছে। বড় বড় বস্তা বোঝাই তিনখানা ডিঙি বেরিয়ে এলো গ্রামের ভেতর থেকে—এসে ভিড়লো বড় চালানি নৌকোর গায়ে। সদাশিব স্বয়ং ডিঙিতে ছিল, নৌকোয় উঠে এলো।

মাঝি বলে উঠলো, 'মাল তো উঠবে কর্তা—এদিকে দু-জনের কারুর দেখা নাই।'

'গেল কোথায়?'

'একজন পাখীর মতো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ঘরে যাবে, আর একজন মরতে। এ লোক দিয়ে কাজ চলবেনি।'—

অভিযোগে কান নেই সদাশিবের। ডিঙি থেকে নৌকোয় বস্তা তোলার ব্যাপারেই তখন নজরটা বেশি।

মাঝি বিড় বিড় করে বললো, 'শালা ই লাইনের দোষ। ক্ষেপে উঠলে—বাস্।'

দেখতে দেখতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে নৌকো বোঝাই হয়ে গেল বস্তায়। বস্তার ওপরে কুমড়োর চালান। এসব শেষ হওয়ার পর সদাশিব যখন মুখ তুললো তখন ভবানী এসে গেছে। তাকে সামনে পেয়েই খেঁকরে উঠতে যাচ্ছিল সদাশিব। ভবানী বলে উঠলো, 'ছোট গিন্নী একটা ভালো সুবাস তেল আনতে বলে দিল মনে করে।'

হঠাৎ জল হয়ে গেল সদাশিব। ছোট গিন্নী সদাশিবের তৃতীয় পক্ষ। হাসি-হাসি গলায় বললো, 'তোকে বললো বুঝি? আসবার সময় আমাকে তো কিছু বললো না! তা মনে করিয়ে দিবি একবার তে-খালির গঞ্জে। আমি পাঁচ ঝামেলার মানুষ। টাকা দিয়ে দেবো তোর হাতে।'

ভবানী মাথা চুলকে বললো, 'টাকা মোকে দিয়েছে—দুটো টাকা।'

নৌকোর পেছন থেকে মাঝি হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠলো, 'এঃই —মরেছে।'

সদাশিব বললো, 'ক্যাদারকে হাঁক দে একটা—এখুনি ছাড়তে হবে নৌকো। রাতের জোয়ারে আজ লক গেট পেরিয়ে নদীতে বেরিয়ে যেতে হবে।'

দূরের পাল্লা। বারো মাইল পথ। কেদার যদি আজ রাতে না ফেরে তা হলে একাই টেনে যেতে হবে নৌকো। এ সব ব্যাপারে সদাশিব কড়া লোক। পুব আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো ভবানী—সন্ধ্যে তারাটা অনেক দূর উঠে এসেছে। কেদারের তখনও দেখা নেই। ক্যানেল পাড়ে উঠে এলো ভবানী। মুখের কাছে দু-হাত চোঙের মতো করে হাঁক ছাড়লো:

স্যা…ঙাৎ…হে…এই…ই

নৌকোর দাঁড়ি-মাঝিদের বিশেষ এক ধরনের হাঁক। অন্ধকারে নদীতে নৌকো থেকে নৌকোয় এমনি ক'রে হাঁক পেড়ে সাড়া নেয়। সে হাঁক বহুদূর পর্যন্ত চলে যায় কেঁপে কেঁপে।

ভবানী হাঁক পেড়ে কান খাড়া করে রইলো—পাল্টা কোনো সাড়া আসে কি-না দূর থেকে। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল খুব কাছে। কেদার আসছে। কেদার হেসে বললো, 'ভয় নাই স্যাঙাৎ—এসে গেছি।'

'এখুনি ছাড়তে হবে নৌকা।'

'কুচপরোয়া নাই। চলো।'

ভবানী হাসলো কেদারের দিকে চেয়ে। বিকেলের মরা ঝিমধরা কেদার অন্ধকারে যেন বেঁচে উঠেছে।

নৌকো ছেড়ে দিল।

গ্রামের রাত্রি। দূরের গ্রামগুলিতে নিষ্প্রদীপ। অন্ধকার নির্জন আর গভীর। ক্যানেলে আর কোনো নৌকো নেই। যতদূর চোখ যায় জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। জনমানবহীন একটা আদিম ভূখণ্ড যেন সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে পড়ে আছে আকাশের তলায়, যেন কোনো একদিন হয়ত জীবন্ত মানুষের দল এসে কলরব করে উঠবে, আলো

জ্বলবে, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে। যেন তারই অপেক্ষায় পড়ে আছে সবটা।

জনমানবহীন সেই অন্ধকারে ক্যানেল পাড়ের ওপরে পাঁচ শ' মণি ভরা কিস্তির কাছি কাঁধে করে ভূতের মতো দুটি মানুষ কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। আগে আগে কেদার। ওদিকে অন্ধকারে তীব্র দৃষ্টি মেলে নৌকোর মাথার কাছে ঘুপটি মেরে বসে আছে সদাশিব। কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু হালটা বিশ্রীভাবে আর্তনাদ করে উঠছে।

ভবানীর চুপচাপ ভালো লাগছে না। বললো, 'লৌকায় এবার কি মাল লিয়ে যাচ্ছি বল দিকিন স্যাঙাৎ?'

'কুমড়োই তো দেখলাম।' কেদার বললো, 'কিন্তু শালার কি ভারি গো।'

ভবানী হেসে বললো, 'কুমড়ো লয়—ধান। কুমড়োর তলায় ধানের বস্তা—মেলা ধান হবে।'

'বুঝেছি। চোরাবাজারের ধান। তাই সন্ধ্যের পরে মাল বোঝাই। তাই রাতারাতি ক্যানেল ছেড়ে নদীতে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বললো কত্তা।'

'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বল দিকিন?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো ভবানী।

'কি জানি।'

'তে-খালি গো।' সরস কৌতুকে ভবানী বললো, 'ধানকল।'

ভবানী মৌজ হয়ে আছে তখন থেকে—যখনি সে শুনেছে নৌকো যাবে এবার তে-খালির গঞ্জে। কতদিন পরে যাবে আবার সেখানে।

কেদার কিন্তু কোনো কৌতুক বোধ করে না। বেপরোয়া কেদারের কোনো কিছু মনে নেই।

ভবানী একটি গানের লাইন আওড়ালো: 'কালো না ভোমরা, রাঙা না ফুল গো।'

মনে পড়েছে এবার কেদারের। সে বাকী লাইনটি আওড়ালো: 'কুঁচ বরণ কন্যা মেঘবরণ চুল গো।' বললো, 'ভুলেই গেছলাম স্যাঙাৎ। কতদিন যে যাইনি সেদিকে।'

সে পাঁচ-সাত বছর আগের কথা। কেদারের তখন নৌকো ছিল, ভবানী মাল কিনতে যেত সে নৌকোয় চড়ে। ধানকলের পেছনে নৌকো এসে পড়লেই কেদার দাঁড় টানতে টানতে গেয়ে উঠতো:

কালো না ভোমরা রাঙা না ফুল গো।...

ভবানী হাসি মুখে চেয়ে চেয়ে দেখতো, একটি বছর ষোল বয়সের মেয়ে খেয়াঘাটের পাশ-ঘেঁষা একটি কুঁড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সকৌতুকে। বাপ ছিল তার খেয়াঘাটের মাঝি। মেয়েটার নাম ছিল ভোমরা।

খেয়াঘাটের পাশে ছোট একটি কুঁড়েতে ছিল বাপ-বেটির সংসার। বাপের সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ জমিয়েছিল বেপরোয়া কেদার—ভবানীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। তারপর থেকে ভবানী মাল করতে যেত কাছের গঞ্জ পেছনে ফেলে দূরের সেই তে-খালির গঞ্জে। সন্ধ্যের পরে গিয়ে গল্পগুজব করতো ভোমরার বাপের সঙ্গে, তামাক খেত আর হঠাৎ জলতেষ্টা পেয়ে যেত। কেদার হাসতো মুখ টিপে। বলতো, 'দেখতে চুপচাপ কিন্তু লোকটি তুমিও

কম লয় স্যাঙাৎ। জল খাওয়ার নামে সামনা সামনি পেয়ে গেলে একেবারে। ফিরতিবার আমিও জল খাবো।'

যেন নেশা লেগে গিয়েছিল—দু-জনেরই, দু-জনেরই সমান উৎসাহ। গঞ্জ থেকে ফেরার পথে মুষড়ে থাকতো দু-জনেই, কথা কইতো ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা। তবু সব কথার মাঝখানে ভোমরার কথাই এসে পড়তো বারে বারে। ভেবে যেন কুলকিনারা পেত না—বিয়ের কথাটা কে কিভাবে তুলবে।

তারপর ভোমরার বাপই একদিন তুলেছিল কথা। এক গাল তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, 'লা-লৌকার লোককে আমার বিশ্বাস নাই। কোথায় সে ঘুরবে ঘাটে অঘাটে—মেয়ে আমার একলা পড়ে থাকবে। এমন একটি ছেলে যদি পাই কিছু জমিন জায়গা আছে।' বলে ভবানীকেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'আছে তোমার সন্ধানে?'

কেদার চটে বলেছিল, 'কেন—লা-লৌকার লোক কি মানুষ লয়?'

বুড়ো চুপ করে গিয়েছিল।

ভবানীর মুখের দিকে চেয়ে কেদার তারপর রাগ সামলে বলেছিল, 'আমার স্যাঙাৎ তো আছে—জমি জায়গা ব্যবসা, সব আছে। দাও না তার সঙ্গে সাদি।'

সেদিন এর বেশী আর কথা এগোয়নি। দু-জনেই চুপচাপ নৌকোয় এসে উঠেছিল। অনেকক্ষণ কারুর মুখে আর কথা নেই। তারপর ভবানী বলেছিল, 'ও মেয়ে আমি বিয়ে করবনি স্যাঙাৎ।'

'কেন?'

'তুমি কষ্ট পাবে।'

কেদার ম্লান হেসে বলেছিল, 'আমি কষ্ট পাব! না স্যাঙাৎ—ও সব

একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বিয়ে কর, ঘর সংসার কর। সত্যি তো, আমি লা-লৌকার লোক—ঘাটে ঘাটে দিন কাটে। তোমার কাছে ভোমরা সুখে থাকবে।'

তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে। পাঁচ বছর পরে আবার চলেছে তারা তে-খালির গঞ্জে। ভবানীর মনে মনে পুরাতন সেই সোনার মতো দিনগুলি ঘনঘোর হয়ে আসে। গ্রামের শান্ত স্থির জীবনের মাঝখানে সেদিনের আশা ও কামনা আজ তার মনের মধ্যে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে : ভাবীকাল তখন ছিল আশা আশ্বাসে ভরা। শুকিয়ে যাওয়া চারা ধানগাছের মতো নেতিয়ে পড়ে আজ ভবানী। গতি হয়ে আসে শ্লথ। পেছনে গুণের কাছি ঝুলে পড়ে আলগা হয়ে।

কেদার বললো, 'জোর লাগাও স্যাঙাৎ—দূরন্ত পথ।'

ভবানী সচকিত হয়—লজ্জা পায় মনে মনে। কাছিতে একটা জোর টান দিয়ে ঝুঁকে পডলো। বললো, 'তুমি যদি ভোমরাকে বিয়ে করতে স্যাঙাৎ—তবে বেশ হত।' ভোমরার কথাই তুলতে চায় ভবানী—তার কথাই আজ কইতে চায় প্রাণ ভরে। জমি গেছে, ব্যবসা গেছে—খরচের জন্যে লোকটার বাকী আছে যেন ওইটুকু শুধু।

কেদার হেসে উঠে বললো, 'তারপর শালা মাঝির মতো ঘরে ওদিকে ভাঁ।'

'মাঝির কি হলো ?'

'বৌ পালিয়েছে কার সঙ্গে। ও শালা তো ঘোরে ঘাটে ঘাটে। শালার ই লাইনে ঘর থাকতেও নাই। বুঝলি—ভোমরার বাপ তখন ঠিক বলেছিল।'

মাঝির মুখেও আজ এই কথা শুনেছে ভবানী। গুণ টানতে

টানতে তবু সে ঘর বাঁধার কথাই ভাবে, ভোমরার কথাই ভাবে। একটা আশ্চর্য নাম আজ যেন তার জীবনের আশা আশ্বাসগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছে।

কেদার বললো, 'ভোমরার যদি বিয়ে না হয়ে থাকে তবে তুমিই এবার ঠিক করে ফেল স্যাঙাৎ। ঘর-টান লোক তুমি, ঘর-সংসার পাত। আমি জলে ভাসা লোক।'

বিষণ্ণ গলায় ভবানী বললো, 'আমিও তো আজ জলে ভাসা লোক স্যাঙাৎ। যে সদাশিবের কাছে সর্বস্ব দিছি—তারই নৌকার দাঁড়ি, বাঁধা মাইনার চাকর।'

'আমি তোমার স্যাঙাৎ গো—দুঃখের দিনের সাথী। ফাটা কপাল দু'জনেরই।' কেদার বললো। 'মোর গেছে লোকা আর তোমারই জমির ধান হয়তো আছে এই লৌকায়। কাঁধে করে টেনে টেনে লিয়ে চলেছি আজ দু'জনে।'—

ভবানী শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। বড় ক্লান্ত লাগে—বড় দুর্বল মনে হয় ভবানীর। ভোমরা এবার সকৌতুকে দেখবে—সদাশিবের নৌকোয় দাঁড় বেয়ে বেয়ে এলো ভবানী।

ভবানী বললো, 'লৌকা একটু থামিয়ে তামাক খেলে হত স্যাঙাৎ।'

'বেশ—খেয়ে লাও।' কেদার দাঁড়াল।

ওদিকে সদাশিব খেঁকরে উঠেছে, 'ফ্যাসাদে ফেলবে শালারা। যেইখানে বিপদ—সেইখানে নৌকা বেঁধে তামাক খেতে বসলো।'

এখান থেকে মাইল খানেক তফাতে থানা। সদাশিব চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কেদার গুণ দড়ি কাঁধে তুলে নিয়ে বললো, 'চল স্যাঙাৎ। চোর শালার ধরা পড়ার ভয়।'

'চল।' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ভবানী।

তারপর একটানা মাইলের পর মাইল গুণ টেনে এল তারা। নিরাপদে লক গেট পেরিয়ে নদীতে পড়লো। এবার পড়লো দাঁড়। ক্যানেলের মুখে নদীতে নৌকোর ভিড়। সে ভিড় এড়িয়ে কিছুটা দাঁড় বেয়ে এসে নির্জন নদীচরে নোঙর করলো তারা। নদীর কিনার থেকে সুরু হয়েছে জালপাই মহাল—দিগন্তবিসারী ধানবন। থানা পুলিস বহুদূরে। সদাশিব এবার নিশ্চিন্তে ছইয়ের ভেতরে ঘুমোতে গেল।

ভবানী বললো, 'শোবে কোথায় বলো দিকিন স্যাঙাৎ। এই কুমড়োর ওপর কি শোয়া যায়?'

'চলো ডাঙায় উঠি।'

দু-জনে ডাঙায় উঠে গেল। কাঁধের গামছাটা মটিতে পেতে ধুপ ধুপ করে সোজা হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো দু-জনে।

কেদার বললো, 'এমন সময় একটু তাড়ি পেতাম যদি। শালার গা-হাত বেথা হয়ে গেছে।'

ভবানীর মনে পুরোনো দিনের স্বপ্ন। বললো, 'কাল এমন সময় তে-খালির গঞ্জে।'—

কেদার হেসে বললো, 'এমন সময় ভোমরা কাছে থাকলে কেমন হত বল দিকিন স্যাঙাৎ?'

বড় ভালো লাগতো ভবানীর। কিন্তু ঠিক এইখানে না—কোন একটা গ্রামে, কোনো একটা ঘরে। কেদার সে কথা ভাবে না। তার শুধু একটু নেশা—একটা মেয়েমানুষ।

ভবানী বললো, 'তোমার ভোমরা কি আর কোথায় কি। তোমার সব সমান। শুধু দু-দণ্ডের আমোদ।'

কেদার চুপ করে রইলো।

ভবানীও চুপ করে যায়। এই নির্জন নদী-তীরে মাটিতে শুয়ে শুয়ে বড় বেশী করে ঘরের কথা মনে পড়ে, গ্রামের কথা মনে পড়ে, একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। ঘুম আসে না—চোখ জ্বালা করে।

ভবানী জিজ্ঞস করলো, 'যারা গুণ টানে তারা কি বেশী দিন বাঁচে না স্যাঙাৎ?'

কেদার তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে শুধু বললো, 'হুঁ'

'মাঝির বৌ পালিয়েছে কতদিন?'

কেদার শুধু হুঁ দিল।

অসংখ্য কথা মনে আসে ভবানীর—অসংখ্য এলোমেলো কথা। শেষ সে বললো, 'মোর কি ইচ্ছে জানো স্যাঙাৎ?'

কেদার কোনো সাড়া দিল না। ভবানী তবু বলে চললো, 'তুমি নৌকা বাঁধতে চাও বাঁধো। আমি যদি পারি, আগে হাল-গোরু, তারপর জমি।'

কেদার ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে। সে কথা কেউ শুনলো না। নিস্তব্ধ অন্ধকার শব্দতরঙ্গে শুধু একটু কেঁপে উঠে আবার জমাট হয়ে গেল। নিঃশব্দে জমাট হয়ে গেল। কেদার পাশ ফিরে শুতে গিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো ঃ

'আঃ মাগো।'—

শুকতারা উঠেছে নদীর ওপারে—আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাত শেষ হয়ে যাবে। ভবানী জ্বালা করা চোখ দুটো জোর করে বন্ধ করলো। আশা আর স্বপ্নগুলো তবু যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বন্ধ চোখের ওপরে, মনের ওপরে ক্ষুধার্ত এক পাল নেকড়ে বাঘের মতো।

পলি ভরাট মজা নদী। ভাটার সময়ে অতবড়ো চওড়া নদীটা চড়াপড়া সারা বুকটা চিতিয়ে পড়ে থাকে—যেন ডাঙা। সারা দিন সেই চড়ায় নোঙর করে রইল সদাশিবের নৌকো। বিকেলের দিকে জোয়ার এলো। দু-খানি দাঁড় পড়লো আবার।

কেদার দাঁড়ে প্রথম টান দিয়েই ভবানীর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো:

কালো না ভোমরা রাঙা না ফুল গো। ···

ভবানী হাসলো। এ সেই পুরানো দিন ··· পাঁচ বছর আগের মতো যেন। তবু কেমন যেন তাল কাটা মনে হয়।

সন্ধ্যের মুখোমুখি নৌকো ভিড়লো এসে তে-খালির গঞ্জে, আরও কয়েকটি বড় বড় চালানি নৌকোর পাশে। দূর থেকে অদ্ভুত লাগে গঞ্জের বাজারটাকে। সারা বাজারটা অলোয় আলো—যেন দেয়ালী উৎসব। নৌকোগুলো যেখানে ধানকলের পেছনটায় নোঙর ফেলেছে সার বেঁধে, সেখানে অন্ধকার। সেখান থেকে শুরু হয়েছে ঘন জমাট অন্ধকারের সমুদ্র — নদী জুড়ে, জালপাই মহাল জুড়ে, অনেক গ্রাম-গ্রামান্তর জুড়ে। সেই নিরুদ্দেশ অন্ধকারের মাঝখানে গঞ্জের বাজারটাকে মনে হয় একটা আলোর পিণ্ড। অন্ধকার আকাশের অনেকখানি পর্যন্ত

আলো ছিটকে গেছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে—ধানকলের তিনটে চোঙ আকাশে উঁচু হয়ে আছে। হাওয়ায় বিশ্রী ধানপচা গন্ধ।

ভবানী চেয়ে চেয়ে দেখছিল ধানকলের চোঙগুলো। বললো, 'দুটো চোঙ ছিল স্যাঙাৎ—চারটে হয়েছে।'

'হ্যাঁ স্যাঙাৎ—আর সদাশিব হাজরার নৌকায় দাঁড়ি হয়ে এসেছি মোরা দুই স্যাঙাৎ,' কেদার বলে উঠলো। কথায় আত্মঘাতী বিদ্রূপ।

পাঁচ বছরে দুটা চোঙ বেড়েছে। অনেক জিনিস উল্টেপাল্টে গেছে। ভোমরা কেমন আছে? মুখ ফুটে বলে না—মনে মনে ভাবে ভবানী।

ভবানী চুপচাপ বসে রইলো। সদাশিব উঠে গেছে ধানকলের গদিতে। রাতারাতি মাল খালাস ক'রে নৌকো নিয়ে ফিরে যাবে আবার রাতের জোয়ারে। ভবানীর মন উসখুস করছে খেয়াঘাটের দিকে যাওয়ার জন্যে।

ভবানী ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'মোরাও যাই চলো স্যাঙাৎ—একবার খোঁজ করে আসি।'

ধানকলের পেছন দিয়ে নদীর ধারে ধারে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে খেয়াঘাটের দিকে—যেখানে এসে মিলেছে মহকুমা শহরের পাকা শড়ক। তারই একটু তফাতে বাবলা বনে ঘেরা একটা ডোবার ধারে ছিল পাঁচ বছর আগের একটা কুঁড়ে। তার চিহ্নও নেই। আরও কিছুটা পশ্চিমে হয়েছে নতুন একটা কুঁড়ে—এসেছে নতুন মাঝি। নীলাম হেঁকে ঘাট জমা নিয়েছে নতুন লোক—নতুন ধানকলের গয়ারাম মারোয়াড়ী।

কেদার অবলীলায় বললো, 'বোধ হয় মরে গেছে।'

'দু-জনেই!'

'হতে পারে। কত কি তো হয়ে গেল।'

ভবানী চুপ করে রইলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো ভূতের মতো।

কেদার তার হাতে মৃদু একটা টান দিয়ে বললো, 'চলো—তাড়ি খেয়ে লি একটু। মনের বেথা, গায়ের বেথা সব চলে যাবে গো স্যাঙাৎ—চলো। ভাকু তাড়িয়ালের কারবার শালার ঠিক আছে বোধ হয়।'

ঠিক আছে—হয়তো সে-সব ঠিক আছে। শুধু ভবানীর মনের মধ্যে ঠিক এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শূন্যতা। একটা নরম মাটির ভিতের ওপরে খাড়া করা তার সাধের ঘর—তার ব্যবসা, তার জমি আর জীবন, সব ভেঙে পড়েছে এক মুহূর্তে হুড়মুড় করে। অন্যমনে সে কেদারের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

ধানকল ছাড়িয়ে কিছুটা গিয়েই একসার কুঁড়ে। কয়েকটি কুঁড়ের গায়ে আলকাৎরা বা খড়ি দিয়ে লেখা—'প্রবাসী থাকিবার স্থান।' উটকো লোক, গ্রামের পাইকার ব্যবসায়ী গঞ্জে হাট-বাজার করতে এসে রাত্রি বাস করে এইখানে। এরই পাশ ঘেঁষে লম্বা চালা। ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা। সামনে বসে সন্ধ্যের পরে জটলা করে বিভিন্ন বয়সের গুটি কয়েক মেয়ে-মানুষ, হাসে, চল্‌তি লোকের দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে। ধান-কলে তারা কাজ করে দিনের বেলা—রাতে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে কপালে কাঁচ পোকার টিপ পরে কুঁড়ের সামনে গল্পগুজব করে। প্রবাসীদের কুঁড়ে থেকে ছিটকে আসে এক-আধ জন এদের কুঁড়েতে, কখনো খেয়ালী মহাজন—গ্রামের ভদ্রলোক, অধিকাংশই আসে মাঝি-মাল্লার দল।

সেই পথ দিয়ে ঘুরে চলেছে কেদার।

ভবানী বললো, 'তোমার মতলব ভালো নয় স্যাঙাৎ। যাবে কোথায় বল দিকিন? ইদিক দিয়ে গেলে তাড়ির দোকানে যেতে ঘুর হবে অনেকটা।'

কেদার হেসে বললো, 'চলো ঘুরে যাই একটু। দেখে যাই। ভয় নাই—তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

দূরে কতগুলি মেয়ে জটলা করছে এক জায়গায়। দূর থেকে বাজারের আলোর মলিন রেশ একটু এসে পড়েছে সেখানে। কাছাকাছি এসে দু-জনেই থমকে দাঁড়ালো।

কেদার বললো, 'ওই দেখ স্যাঙাৎ—তোমার ভোমরা।'

ভবানী দেখেছে। ভবানীর মনের মধ্যে আবার একটা ওলট পালট সুরু হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। কেদার বেপরোয়া ভাবে এগিয়ে গেল।

'কি গো, চিনতে পার?'

'ও মাগো—কত দিন পরে দেখা গো!'

বহুদিন পরে দেখা। ভবানী দাঁড়িয়ে রইলো দূরে। দূর থেকে আর কোনো কথা শোনা যায় না—শুধু দেখা যায়, কেদারের অতি পরিচিত সেই ক্ষেপে ওঠা চোখ মুখ, ভোমরার ঘাড় বেঁকিয়ে হাসি। সবটা অসহ্য লাগছে ভবানীর। আর যেন সে দাঁড়াতে পারছে না।

কেদার ফিরে এসে বললো, 'টাকা আছে স্যাঙাৎ—একটা টাকা?'

ভবানী চুপ।

কেদার আবার বললো, 'থাকে তো চল। মোর কাছে শুধু একটি টাকা আছে।'

ভবানীর কাছে আছে দুটো টাকা। সদাশিবের তৃতীয় পক্ষের দেওয়া সুবাস তেল কেনার দুটো টাকা। কয়েকটি মুহূর্ত। ভবানী চুপ করে আছে—মনের মাঝে ঘটে যাচ্ছে একটা প্রচণ্ড ভাঙা-গড়া। পাশাপাশি দুটি মুখ ভেসে উঠেছে। একটি ওই আধো আলো-অন্ধকারে আর একটি অনেক দূরে, কোনও এক গ্রামে, কোনও এক ঘরে—একটি প্রশান্ত সুন্দর মুখ, পবিত্র শান্ত। সে মুখটা জিতে গেল। একটা অস্বস্তিকর ঘৃণা সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে ভবানীর মনের মধ্যে।

ভবানী বললো, 'নাই—মোর টাকা নাই।'

'তবে তুমি চলে যাও।'

কেদার চলে গেল ফিরে।

ফিরতি পথে বড় একা একা লাগে ভবানীর। সে যেন হেরে গেল। সবখানে হেরে গেল সে। হেরে গেছে সদাশিব হাজরার কাছে। হেরে গেল বেপরোয়া কেদারের কাছে, পাঁচ বছর পরের ভোমরার কাছেও। পাঁচ বছর পরে ···

কেদার বলেছিল, ভাকু তাড়িয়ালের কারবার হয়তো ঠিক আছে। ঠিকই আছে। এক কোণে একটা কেরোসিনের বাতি জলছে। ম্লান আলোয় দু-তিনটে জটলা করে গোল হয়ে বসেছে মাঝি-মাল্লারা, আড়তের কুলিরা। পাশে গড়াগড়ি যাচ্ছে কয়েকটা খালি তাড়ির কলসি—হাওয়ায় পচা টক গন্ধ। এখান থেকে বাজারের আলো দেখা যায় না, এখানে এসে পৌছয় না বেনেতি বাজারের কলরব। কতকগুলো লোক মৌজ হয়ে আছে এখানে নিজেদের চেঁচামেচিতে—গানে, হল্লায়। দূর থেকে মনে হয়, কতকগুলো ক্ষ্যাপা জানোয়ার যেন একটা জায়গায় গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গর্জে মরছে।

ভবানী এসে ঢুকলো।

তার ঢোকাটাই কেমন বেয়াড়া লাগে সকলের। সবাই চমকে ওঠে—পিট পিট করে তাকায় তার দিকে। লোকটা যেন এখুনি সকলকে পিটোতো শুরু করবে। তাদের গান থেমে গেল। একটা লোক একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে বসে চোখ বুজে প্রাণ-পণে দুহাতে বাক্সটা পিটিয়ে যাচ্ছিল—সেও চোখ মেলে চাইল। নতুন লোক দেখে বলে উঠল:

'বৈঠ্ যাও দোস্ত—বৈঠো, তাড়ি খাও—ফুর্তি করো।'

লোকটা নতুন মারোয়াড়ী ধান-কলের দারোয়ান—কথা বলে হিন্দী আর ভাঙা বাঙলা মিশিয়ে। তারপর আবার সে চোখ বুজে বাক্স পিটোতে স্থরু ক'রে।

দল ছাড়া হয়ে মুখ গুঁজড়ে বসে আছে আর একটি লোক—আধবুড়ো মানুষ। মাটিতে দাগ কেটে যাচ্ছে শুধু। মুখ তুলে সে দু-হাত জোড় করে অত্যন্ত বিনীতভাবে ভবানীকে একটি নমস্কার করলো।

কয়েক মুহূর্ত শুধু চুপচাপ। তারপর আবার স্থরু হয় গান আর হল্লা। তার সঙ্গে ভবানীর গলাও কখন মিশে যায়। যেন প্রাণপণে সে চেঁচায়—গান ধরে দেয়।

কিছুক্ষণ হৈ-হল্লা ক'রে আর ভালো লাগে না ভবানীর। বারে বারে মনে পড়ে যায় কেদার আর ভোমরার মুখ। তাড়ির আড্ডা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। পা টলছে, গা গরম হয়ে গেছে।

সেই দলছাড়া নিঃসঙ্গ লোকটি বিনীতভাবে আবার নমস্কার করলো।

নৌকোয় ফিরে এসে ভবানী গুম হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

মাঝি চিরদিনের মতো নৌকোয় পায়চারি করছে, আর মুখে চোখে জ ল দিচ্ছে আঁজলা আঁজলা।

ভাবানী দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো হঠাৎ, 'মর শালা।'

বলে সে নৌকো থেকে নেমে পড়লো। ট্যাকটা একবার টিপে দেখলো—তখনো আছে এক টাকা বারো আনা, চার আনার তাড়ি খেয়েছে। কেদার বলেছিল—একটাকা: থাকে তো চল।···তারও বেশী আছে তার কাছে। চুলোয় যাক্ সুবাস তেল কেনা।

ভাটায় নদীর জল নেমে গেছে অনেক নিচে। এক হাঁটু পলি-মাটির কাদা ঘেঁটে এগুলো ভবানী।

তীরের শুকনো মাটিতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো সে: কেদার আসছে টলতে টলতে। সে-ও তাড়ি খেয়েছে। থমকে দাঁড়ালো এসে সামনা সামনি। ভবানীর ভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে বললো, 'কে গো, স্যাঙাৎ?'

হঠাৎ একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ভবানী। প্রাণপণে গলা চেপে ধরেছে সে কেদারের।

'ভোমরার কাছে যাও তুমি শালা।'

কেদার কথা বলতে পারছে না—দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

দু-জন ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে গড়িয়ে গেল নদীর কাদার মধ্যে। পলি মাটির মধ্যে পরস্পরকে ঠেসে ধরে তারা। হঠাৎ ছিটকে পড়লো ভবানী একটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে। কেদার কষিয়েছে একটা প্রচণ্ড লাথি—সোজা তলপেটে।

ভবানী পড়ে রইলো তেমনি। কেদার টলতে টলতে কোন রকমে এগিয়ে গেল নৌকোর দিকে। গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো নৌকোর

মাথার কাছে। সারা গা অবশ হয়ে আসছে। গলাটা এখনও যেন কে চেপে ধরে আছে।

নৌকোগুলি অনেকটা দূরে—ভাটার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি নিচে নেমে গেছে জলের মুখে মুখে। অন্ধকারে ঝিম হয়ে আছে। সেখানে কোন সাড়া শব্দ নেই।

লোকজন জোগাড় করে রাতারাতি বস্তা সব উঠে গেছে ধানকলের গুদামে। শুধু কুমড়োগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে নৌকোর ওপরে। শেষ-রাতের জোয়ার শেষ হয়ে ধরলো ভাটার টান। তবু ভবানীর দেখা নেই।

নৌকো থেকে নেমে এল কেদার। নদীর জল কমছে চোঁ চোঁ করে। এক হাঁটু কাদা ভেঙে ভেঙে গিয়ে দাঁড়ালো সে সেই জায়গাটায়—যেখানে দু-জন ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে কাল রাতে—উল্টে পড়েছে ভবানী। কিন্তু সে যায়গাটা যেন চেনাই যায় না আজ ভোরে, যেন কোনো কিছুই হয়নি তাদের বহুদিনের দুই স্যাঙাতের ভেতরে। রাতের জোয়ারে পলি পড়ে সবটা দেখাচ্ছে মসৃণ পালিসের মতো। এতটুকু আঁচড় নেই কোথাও। তবু আঁচড় লেগেছে একটা কোথাও—গভীর, বেদনার্ত। ভবানী বলেছিল কাল রাতে চরের বালিতে শুয়ে শুয়ে: তুমি লৌকা ভাসাও স্যাঙাৎ—আমি যদি পারি, আগে হাল-গোরু, তারপর জমি।... তারপর

পাঁচ বছর পরে—ভোমরা—গঞ্জের বাজার—একটা টাকা।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে দুই হাত চোঙের মত করে হাঁক দিল সে:

'স্যাঙা … ৎ … হে … ই।…

তারপর কান খাড়া করে রইলো অনেকক্ষণ। কোনো সাড়া এলো না। শুধু ভাটার টানের অবিশ্রান্ত কলকলানি। অবাক হয় কেদার : লোকটা কি তবে ভেসে গেল!—

নৌকোয় ফিরে এলো মুখ শুকনো করে। বলল, 'পেলাম না খুঁজে। গেল কোথায় লোকটা!'

মাঝি নদীর দিকে মুখ করে বিড় বিড় করে শুধু বললো, 'শালা মরেছে।'

'মরুক।' সদাশিব তাড়া দিয়ে বললো, 'ছেড়ে দে নৌকো।'

'ছাড়', বলে নৌকো থেকে নেমে গেল কেদার।

'তা তুই যাচ্ছিস কোথায়?' সদাশিব খেঁকরে উঠলো।

'মোর স্যাঙাৎকে খুঁজতে।'—

সেই তার হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া বেপরোয়া সবল পা ফেলে ফেলে পাড়ের ওপরে উঠে গেল কেদার। একবার ফিরেও তাকালো না।

স[illegible]লে

শীতের সকাল। মহকুমা শহর থেকে একটি ট্যাক্সি এসে অবনীমোহনকে ভোর ভোর খেয়াঘাটে পৌছে দিয়ে গেল। সঙ্গে দু-জন সহযাত্রী—তাদের সাধারণ বেশবাস আর শীতের পোশাকে সমৃদ্ধির চিহ্ন, পাকা বয়সের লোক প্রায় সবাই। দূরবিসারী শূন্য মাঠের শেষে তখন ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে ছাব্বিশে জানুয়ারীর সূর্য সবে উঠেছে। উনিশ শো সাতচল্লিশ সাল।

অবনীমোহন গাড়ী থেকে নেমে সামনে তাকালেন। কিসের যেন একটা অভাব অনুভব ক'রলেন। খেয়াঘাটের কাছে অপেক্ষমান ছোটখাটো একটা ভিড় আশা করেছিলেন তিনি: গ্রামের কৌতুহলী কৃষক, কাচ্চাবাচ্চা, স্ত্রীলোক—যেমন বছরের পর বছর ধরে ঠিক এমনি দিনে, এমনি সকালে দেখেছেন। তারপর খেয়া পেরিয়ে গিয়েছেন ওপারে গ্রামের পথে, সদলে। রাজার হাট। সেখানে পতাকা তুলেছেন—নিয়েছেন স্বাধীনতা দিবসের শপথ।

সামনে কিন্তু জন কয়েক মাত্র লোকের জটলা—অবনীমোহনের সহযাত্রী দুটির মতোই কয়েকজন ভদ্রলোক। তাদের ভেতর থেকে একটি পুলিস অফিসার এগিয়ে এলো অবনীমোহনের দিকে—পেছনে

জন তিনেক বন্দুকধারী সেপাই, আর কয়েকজন নীলকোর্তা পরা চৌকিদার।

পুলিস অফিসারটি হেসে নমস্কার ক'রলো। ব'ললো, 'চলুন তা হ'লে খেয়া পেরোই।'

অবনীমোহন নীরবে তাঁর দু'জন সহযাত্রীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। এমন দিনে এমনিভাবে এই লোকটিকে তিনি যেন আশা করেননি এখানে।

একজন পরিচয় করিয়ে দিল, 'চেনেন না? উনি আমাদের থানা অফিসার।'

তারপর ছোট দলটি এগিয়ে চললো খেয়া পেরোতে। টুকটাক্ কথা কইছে সকলে। দারোগাটি ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে বলে চলেছে তার একটি ডিঙি নৌকো জোগাড় করার আশ্চর্য কাহিনী: নৌকোর দাঁড়ি-মাঝি গ্রামের চাষাভুসো—তারা কেমন ক'রে নৌকো লুকিয়েছে, কেমন ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে আর কেমন ক'রে সেপাই ফৌজ দিয়ে আশ্চর্যভাবে দারোগাটি তাদের পাকড়াও ক'রেছে। অবনীমোহন নীরব। তাঁর মনে হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে গতকাল সন্ধ্যের একটি ব্যাপার—অমলের কয়েক ছত্র চিঠির তীব্র কয়েকটি কথা।

অমল ফেরার—বহুদিন কোনো খবর ছিল না তার। উদ্যত হ'য়ে আছে পুলিসের হুলিয়া। হঠাৎ কাল সন্ধ্যের অন্ধকারে চৌকিদারের পোশাক পরা একটি লোক ঘরে এসে সাবিত্রীর হাতে এক টুকরো চিঠি তুলে দিল। অমলের ফেরার হওয়ার পর বাড়ীতে থানা পুলিসের অনেক হ্যাংগামা গেছে। চিঠিটুকু কম্পিত হাতে পড়তে লাগলেন

সাবিত্রী। তারপর সেটি অবনীমোহনের হাতে তুলে দিয়ে পত্রবাহকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ব'লেছিলেন :

'তুমি তা হ'লে চৌকিদার নও !'

'না মা, এ মোর ভাইয়ের পোশাক—লুকিয়ে পরে এসেছি। এমনি এলে ধরে গারদে পুরে দেবে যে !···যদি চিনতে পারে !'

লোকটি তারপর চলে গেল তক্ষুনি।

কয়েক ছত্রে অমল তার মাকে লিখেছিল :

"শুনলাম, আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারী বাবাকে এখানে নিয়ে আসবার মতলব আঁটছে জোতদার মালিকেরা। ভালোই হবে। গ্রামের চাষাভুসো ফসলের লড়াইয়ে ভালো ক'রে চিনেছে তাদের মালিকদের, চিনেছে পুলিসকে। সে সারিতে দরকার এখন একজন বুড়ো নেতার ! বাবাকে ব'লো, বন্দুকের গুলি একটা হাতে এসে লেগেছে—তাছাড়া ভালোই আছি।"

কাল সন্ধ্যের ঘটনা হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে অবনীমোহনের মনে।

খেয়া পেরিয়ে যেতে হবে ক্রোশ তিনেক নৌকোয়। খালের মুখে নৌকো আছে। সে দিকে এগিয়ে চললো ছোট দলটি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সবাই। অবনীমোহন অবাক হ'য়ে তাকালেন দারোগার দিকে। লোকটা খেজুর রস খাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো হঠাৎ চলতে চলতে।

পথের পাশের একটা খেজুর গাছ থেকে বছর পনেরোর একটি ছেলে খেজুর রসের কলসী নামিয়েছে। একটি আধা বয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল ছেলেটির পাশে। দারোগার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই হঠাৎ রসের ভরা কলসীটা উপুড় ক'রে দিল মাটিতে।

দারোগা হুংকার দিয়ে উঠলো, 'এই পাকড়ো মাগীকে।'

সঙীন তুলে দু-জন সেপাই এগিয়ে গেল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইলো নির্বিকার। শান্ত সহজ গলায় ব'ললো:

'পড়িয়া গেল তো কি করব।'—

দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো দারোগা, 'নিজেই তো ফেলে দিলি খানকি মাগী। কোথায় তোর স্বামী?'

'সে এ দেশে নাই।'

'এ দেশে নাই না ধান লুঠ ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে!' দাঁতে দাঁত চেপে দারোগা ব'ললো। 'সব ঝুঁটি ধরে এনে ঢোকাব গারদে—বুঝবি তখন মাগী।'

মেয়েটি চেয়ে আছে শান্ত—অবিচলিত, কঠিন চোখে।

দল এগোলো।

আর একটি মেয়েকে মনে পড়ে যায় অবনীমোহনের—ওইরকম শান্ত—অবিচলিত, কঠিন। লবণ-আইন ভঙ্গের আন্দোলন—তাকে দমন ক'রবার জন্যে চলেছে ব্যাপক ধরপাকড় আর উৎপীড়ন। হাটের ওপরের বাজে মেয়েমানুষ পদ্মা—কয়েকজন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেকবকে আশ্রয় দিয়েছিল ব'লে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। তারপর সওয়াল আর পীড়ন:

'কেন থাকতে দিয়েছিস?'

'ঘর আছে তাই ভাড়া দিয়েছি।'

'ভাড়া দিয়েছি! ··· ভাড়া খাটাচ্ছি তোকে মাগী।'—

পরের দিন পদ্মাকে পাওয়া গিয়েছিল অজ্ঞান অবস্থায় এক মাঠের পাশে: গালে আর বুকে খ্যাপা পশুর দাঁতের ছোবল—সারা কাপড়ে

রক্তের দাগ। আজ বহুদিন পরে চাষীর ঘরের শান্ত একটি বৌয়ের চোখে পদ্মাকে দেখলেন অবনীমোহন। কঠিন আর অবিচলিত।... বহুদিন হ'লো পদ্মা মারা গেছে—প্রতাপদীঘির পদ্মা।

খালের মুখে এসে পড়েছে দলটি।

অবনীমোহনের পুরানো কথার খেই হারিয়ে গেল দারোগার চেঁচামেচিতে। লোকটা হিন্দী আর বাঙলাতে মিশিয়ে পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠেছে:

'আভি পাকাড়কে লাও শালাদের।'—

'কি হ'লো!' অবনীমোহন অবাক হলেন।

দাঁড়ি-মাঝি ডিঙিটাকে ফেলে পালিয়েছে।

'এখন খুঁজে আর লাভ কী!' দলের ভেতর থেকে একজন ব'লে উঠলো, 'তার চেয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক—বেলা হ'লো। আপানার চৌকিদার গুণ টানতে পারবে না?'

'পারবে না কেন? টান শালারা। ডাকাত ব্যাটাদের বেঁধে রেখে গেলি না কেন?'

চৌকিদারগুলো সভয়ে তাকিয়ে ছিল দারোগার দিকে—কাজের হুকুম পেয়ে দড়াদড়ি নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে দারোগা ব'লে উঠলো, 'দেখলেন তো শালাদের কাণ্ড! আজ সভা।—কাল ঢেঁটরা পিটে ব'লে দেওয়া হয়েছে যে আপনি আসছেন। দেখুন শয়তান শালাদের কাণ্ড! ওরা ডাকাত মশায়—স্রেফ ডাকাত। আপনাদের আর মানেটানে না।'

অবনীমোহন শান্ত কণ্ঠে ব'ললেন, 'গ্রাম থেকে লোক পাওয়া যাবে না?'

‘পাবেন? ওই সবগুলো সেপাই চৌকিদার পাঠিয়ে সারা গ্রাম চুঁড়ে ফেললেও একটা লোককে খুঁজে পাবেন না আপনি। গিয়ে দেখবেন—শুধু মেয়েমানুষ আর কাচ্চাবাচ্চা।’

অবনীমোহন শোনেন আর মনে পড়ে যায় নিঃশব্দ প্রতিরোধের আরও কতকগুলি দিনঃ ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন। এমনি গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে গা ঢাকা দিয়েছে সবাই। পিটুনী পুলিসের দল এসে রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম ঘিরে ফেলেছে—ছেলেমেয়ের হাত ধরে কুকুর-বেড়ালের মতো বনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সবাই।

শুধু ধরা পড়ে গিয়েছিল বছর বারো বয়সের একটি ছেলে—চিন্তামনিপুরের পচা।

‘তোদের লোকজন কোথায়?’

পচা বলেছিল, ‘জানিনি।’

‘তোদের গ্রামের বড়লোক কে?’

‘শশীবাবু।’

‘সে কোথায়?’

‘জানিনি।’

‘জানিসনি শালা!’—

তলপেটে ভারী পায়ের বুটের লাথি খেয়ে পচা চিৎ হ’য়ে উল্‌টে পড়েছিল—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এসেছিল এক ঝলক। সে অনেক দিনের কথা। চিন্তামনিপুরের চাষাভুসোরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল পচাকে। মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে।

তারপর ···

'এই—লাগলো, লাগলো। শালারা দেখে টান!' দারোগা চেঁচিয়ে উঠেছে আবার।

মাথা বেঁকে নৌকোটা উঠেছে গিয়ে একেবারে খাল পাড়ের ওপরে। ঠেলাঠেলি ক'রে চৌকিদারগুলো নৌকোটাকে ঠেলে আবার জলে ভাসিয়ে দিল।

নৌকো চললো আবার।

খালের দু-ধারে শূন্য মাঠের পর মাঠ। ফসল উঠে গেছে। অবনীমোহন সেইদিকে চেয়েছিলেন নীরবে। মনের মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে অসংখ্য কথা—একটি বুড়ো নেতার জীবনের অনেক দিনের কথা। 'বুড়ো নেতা'—অমলের তীক্ষ্ণ কথাটা বারবার খোঁচা মারে মনে।

কে একটি লোক আসছে এগিয়ে। গ্রামের কিসান মনে হয়—শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কান মাথা ঢেকে নোনা জলের কষধরা একটা গামছা জড়িয়েছে কয়েক ফেরতা। লোকটাকে দূর থেকে দেখে হঠাৎ মনে মনে খুশি হ'য়ে ওঠেন অবনীমোহন। এতক্ষণ যেন এই রকম একটি লোককেই খুঁজছিলেন তিনি—তাঁর পরিচিত লোকগুলি। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল তাঁর—অনেক দিনকার চেনা গ্রামের লোকগুলি সবাই অমলের মতো লুকিয়ে গেছে কোথায় নিঃশব্দে, অদৃশ্য প্রতিরোধের একটা দেয়াল তুলে দিয়ে।

দূরে হঠাৎ লোকটি থমকে দাঁড়ালো নৌকোটার দিকে চেয়ে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর পেছন ফিরলো লোকটি—ঝুপ্সি একটা কেয়াবনের আড়ালে দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

'এক শালা ডাকু ভাগতা হ্যায়।' একটা সেপাইয়ের চোখে পড়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠেছে।

অবাক হয়ে চেয়ে আছেন অবনীমোহন। সবটা যেন বুঝতে পারছেন না তিনি।

তারপর প্রশান্ত শীতের সকালে রোদে পিঠ দেওয়া নিস্তব্ধ প্রান্তরের ধ্যান ভেঙে বন্দুকের শব্দ হ'লো—একটা। দুটো।···

লোকটাকে আর দেখা গেল না। শুধু নিঃশব্দ শূন্যতা ভরে যায় নিরবচ্ছিন্ন শাঁখের শব্দে—সারা দিগন্ত জুড়ে, আকাশ জুড়ে, চারিদিকের প্রান্তর জুড়ে।

দারোগা দাতে দাত চেপে বল'লো, 'শালাদের সাইরেন।—কত বাজে দেখবো রে শালা!' তারপর অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, 'দেখলেন কাণ্ডটা! হাড় বজ্জাত এই গ্রামের ডাকাত শালারা। সেদিন দুজন ফৌজ গিয়েছিল মশায়—তাদের ঘিরে এক ঘরে পুরে আগুন লাগিয়ে দিলে। আমিও এর পাল্টা শোধ নেবো! শুধু গোটা তিনেক ঘর পুড়েছে, এবার গ্রামকে গ্রাম জ্বলবে।'

গ্রাম জ্বলছেও। অবনীমোহন তাকিয়ে দেখলেন—গাছপালার আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে পোড়া কুটিরের সারি। সবুজ গাছপালাগুলো কেমন কাল্‌চে মেরে গেছে, ঝলসে গেছে।

প্রান্তরের শূন্যতায় শাঁখের রোল কাঁপছে তখনো। অবাক হ'য়ে চেয়ে আছেন অবনীমোহন: তাঁর নির্বাচন এলাকা। মনে হয় যেন উনিশ শো বিয়াল্লিশের উন্মত্ত অগাস্টের দিনগুলো ফিরে এলো হঠাৎ আজ সকালে। নিঃশব্দ প্রতিরোধ নয়—এবার আঘাত। গ্রামের চাষাভুসোরা উদ্দাম আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে থানার উপরে, পোস্ট অফিসে—

প্রত্যেকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপরে। তারপর ধীরে ধীরে আবার গড়ে উঠেছে জনপীড়নের বিপর্যস্ত ক্ষমতা, শয়তান। গ্রাম জ্বলছে—দেশ জ্বলছে। পুড়ছে গ্রামের অসহায় কুটিরগুলি। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আবার আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে বনেজঙ্গলে।

শুধু বগার চরের অন্ধ হরিদাস এমনি এক আগুন-লাগা কুঁড়ের মধ্যে পথ হাতড়ে হাতড়ে মরে গেল—দরজা খুঁজে পেল না সেদিন। ঘরে ধোঁয়ার তাল, বাইরে ফৌজের উদ্যত সঙীন।

তারপর ...

নৌকো চলেছে। জলের প্রবহমান ঘোলা স্রোত ছল্ ছল্ ক'রে উঠছে নৌকোর মাথায়। অবনীমোহনের পুরাতন টুকরো টুকরো কথাগুলি ও বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের টুকরো ঘটনাগুলো সব জড়ো হ'য়েছে যেন—ছড়িয়ে গেছে আজ গ্রামে-গ্রামান্তরে।

'দেখুন ডাকাত শালাদের আর এক কাণ্ড!' অগাধ নিস্তব্ধতার মাঝখানে দারোগার রুক্ষ কণ্ঠ চম্‌কে দিল অবনীমোহনকে।

অবনীমোহন আত্মস্থ হ'য়ে দারোগার দিকে তাকালেন।

দারোগা এক দিকে আঙুল দেখিয়ে ব'ললো, 'ওই যে ওইখানে।'

গত দুর্ভিক্ষের চিহ্ন: মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় জড়ো করা রয়েছে মড়ার মাথা, হাড় কঙ্কাল।

দারোগা ব'ললো, 'ওই সব কোথা থেকে খুঁজে পেতে এনে গ্রাম সুদ্ধ লোক ডেকে ডেকে এনে দেখিয়েছে। ওইসব ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে—ওই রকম ক'রে আর মরবে না। তারপর এই দিনে ডাকাতি—জবরদস্তি ক'রে মাঠের ফসল তুলে নিয়ে যাওয়া!'—

অবনীমোহন তাঁর একটি সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, 'তোমার সব ধান কি ওরা তুলে নিয়ে গেছে জ্ঞান ?'

'না, প্রায় তুশো বিঘে পড়ে আছে এখনও। একটা লোক পাচ্ছিনে যে কেটে ঘরে তুলি। সব শালা একজোট হয়ে গেছে। কিন্তু একি ভাল ? এই জেল-গারদ, গুলি-বন্দুকের মুখে খামাখা মাথা খারাপ ক'রে মরা ! সেইটে ভালো ক'রে বুঝিয়ে ব'লবেন আপনি।'

'হ্যাঁ', দারোগা বললো, 'আরে দেশ তো স্বাধীন হ'য়ে গেছে ! যত সব উদো চাষার কাণ্ড। শালা ঘরের শত্রু বিভীষণ—ফ্যাকড়া বের করেছে দেখুন। গৃহবিবাদ—একি ভালো ? জবরদস্তি ধান তুলে নিয়ে যাওয়া ! মগের মুল্লুক ! দেবো—একে একে কল্ দেবো ব্যাটারা ঠাণ্ডা না হ'লে।'

রাজার হাট। নৌকো এসে গেছে। দলবল উঠলো ডাঙায়।

তিনটি আধা বয়সী কিসান মেয়ে দাঁড়িয়েছিল পথের পাশে—যেন এই দলটির জন্যেই অপেক্ষা ক'রছিল তারা। এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে বয়স্ক মেয়েটি অবনীমোহনের মুখের দিকে একবার চেয়ে নীরবে একটি চিঠি ও একটি কাগজের মোড়ক তুলে দিল হাতে।

চিঠিটা খুলতে সাহস হ'লো না অবনীমোহনের ঃ হঠাৎ অমলের কথা মনে পড়ে যায়। দারোগা তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মেয়েগুলির দিকে চেয়ে কড়া গলায় ব'ললো ঃ

'কি আছে ওতে ?'

'কি জানি।'

'জানিসনে ? দিল কে ?'

'জানিনি। অউ বাবুকে দিতে কইল।'

'বটে! দেখুন তো অবনীবাবু।'

কথায় কথায় দলটি চলেছে ধীরে ধীরে একটি ক্যাম্পের দিকে। পুলিসের অস্থায়ী ক্যাম্প। দলটিকে অনুসরণ ক'রে চলেছে কিসান মেয়ে তিনটি।

চলতে চলতে চিঠি পড়ছেন অবনীমোহন। মুখটা কঠিন হ'য়ে গেছে। চিঠিতে স্বাক্ষর নেই—কিন্তু হাতের লেখা দেখে হঠাৎ হাতটা কেঁপে ওঠে একটু। অমলের লেখা :

'এ অঞ্চলের প্রাচীন এক জাতীয় সংগ্রামের নেতার কাছে আমাদের এক সহকর্মীর শেষ চিহ্ন পাঠালাম। কাল সে মারা গেছে। বুকে তার গুলি লেগেছিল। তার স্ত্রীকে আজ দিন তিনেক হ'লো পুলিস ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছে সওয়ালের জন্যে—তাদের খোঁজ নেবেন। আর আমাদের বিশ্বাস, একজন বিদ্রোহী কিসানের শেষ চিহ্নটুকু বহু সংগ্রামের সৈনিক একজন প্রাচীন নেতা নিশানের মতো ক'রে ওড়াতে আজকের দিনে ভয় পাবে না।'

ক্যাম্পের কাছে এসে পড়েছে সবাই।

দারোগা ব'ললো, 'কি চিঠি অবনীবাবু?'

অবনীবাবু শুধু মোড়কটা তুলে দিলেন দারোগার হাতে।

মোড়কটা খুলে দারোগা আঁৎকে উঠলো : 'একি মশায়! খুন! এ্যাঁ!'

বুকে বাঁধা ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ কোন এক মৃত কিসানের—রক্তে ভেসে গেছে।

অবনীমোহন কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজছেন। তারপর হঠাৎ চোখ আটকে গেল তাঁর ক্যাম্পের পেছনে—একটা গাছের তলায়।

গাছের সঙ্গে পেছনে হাত বাঁধা একটি মেয়ে—নগ্নপ্রায়, পরনে ছেঁড়া ময়লা একটা কাপড়। একটা গণ্ডারের মতো কুঁদো সেপাই সামনে থেকে সঙীন লক্ষ্য ক'রেছে মেয়েটির তলপেটের নিচে। বীভৎস এক হাসিতে ভরে উঠেছে সেপাইটার মুখ। মেয়েটি নিস্পন্দ—মাথাটা ঝুলে পড়েছে একদিকে। তিন দিনের বক্ত-নিপীড়িত, ক্লান্ত, ধর্ষিত একটি মুখ।

ভিড়ের ভেতর থেকে সেইদিকে হঠাৎ ছুটে গেলেন অবনীমোহন:

'এই উল্লুক!—জানোয়ার!'—

কয়েকজন সেপাই গিয়ে ধরে ফেলেছে অবনীমোহনকে।

হঠাৎ একটা হট্টগোল। মেয়েটি ক্লান্ত চোখ তুলে চেয়েছে। তুটো আশ্চর্য চোখ।

দারোগা এগিয়ে এসে ব'ললো, 'মাথা খারাপ করবেন না অবনীবাবু।'

'ছেড়ে দিন ওকে,' অবনীমোহন বুড়ো কম্পিত গলায় ব'ললো। 'ওর স্বামী মরে গেছে কাল।'

'মরে গেছে! চিঠিটা কই দেখি।'

দারোগা এগিয়ে আসছে অবনীমোহনের দিকে। এগিয়ে আসছে। অমল কি ধরা পড়বে এবার—অমল? ··· অবনীমোহনের মুখটা পাণ্ডুর হ'য়ে উঠছে ধীরে ধীরে। হাতের মুঠোয় পাকানো চিঠিটা সকলের অলক্ষ্যে পায়ের তলায় ফেলে চেপে দাঁড়িয়েছেন তিনি। নিঃশব্দে তিনি চোখের ইসারা ক'রলেন কিসান মেয়ে তিনটিকে—পালাক তারা, হয়তো ধরা পড়ে যাবে তাদের নেতা। অমল ···

মেয়ে তিনটি এগিয়ে এলো আরও কাছে—এক সঙ্গে। তাদের

মধ্যে বয়স্ক মেয়েটি ব'ললো, 'আমরা তবে যাই বাবু।' বলে সে অবনী-মোহনের পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রলো আর পায়ের তলা থেকে পাকানো চিঠিটা নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে মুখে পুরে চিবোতে লাগলো।

'কই চিঠিটা'—

'চিঠিটা কোথায় ফেলে দিয়েছি—এইখানে কোথায়—মানে—' অবনীমোহন কম্পিত কণ্ঠে ব'ললেন। চারপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলেন সভয়ে।

'ফেলে দিলেন ? এই ছ্যাখ পকেট।'

দারোগার ধারালো চোখের ইসারায় মুহূর্তে দুজন সেপাই এগিয়ে এসে খানাতল্লাস ক'রতে লাগলো অবনীমোহনের কাপড়-জামা। কিন্তু কোথাও নেই। দারোগা ঘুরে দাঁড়ালো তিনটি কিসান মেয়ের দিকে। তারা তখন ভিড় ছেড়ে সরে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে।

দারোগা পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠলো ঃ

'এই পাকড়ো শালীদের—লে যাও উধার, সওয়াল কর।'

সেই গাছ—সেই কুৎসিৎ গাছটা ··· তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

কাঁপছেন অবনীমোহন ঃ বুড়ো হয়ে গেছেন—বহুদিন ধরে বুড়ো হ'য়ে গেছেন তিনি। নিজের ওপরে তাঁর রাগ হয় হঠাৎ ঃ কিছুই করবার নেই যেন তাঁর ঠিক এই মুহূর্তে।

দু-জোড়া শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে শুধু তিনি ছটফট ক'রতে লাগলেন।



দুই অফিসের দরবার। সার্কেল অফিস আর থানা পাশাপাশি। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে চৌকিদারেরা আসে হপ্তার হাজিরা দিতে। গাঁয়ের মানুষ—চাষা-ভুসোর গোত্র। চাষ আবাদই জীবিকার ভিৎ। তবু গায়ে বেমানান নীলকোর্তা চড়িয়ে অন্য মানুষ হয়ে আসে হাজিরা দিতে। চৌকির খবরাখবর পেশ করে তারা—মার-দাঙ্গা, চুরি-চামারি আর দু-একটা এদিক-ওদিকের খোঁজ-খবর। তারই ভেতর থেকে সুকৌশলে সংগৃহীত হয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ওপরের জন্য তৈরী হয় রিপোর্ট। চৌকি, থানা থেকে লাট দফতর—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ঠাসবুনোন শাসন ঘাঁটি।

কিন্তু ঘাঁটি ঠিকই আছে—নেই শুধু শান্তি। অন্ন-বস্ত্রহীন গ্রাম-গ্রামান্তর। অতএব শৃঙ্খলা,—হয়তো বিপজ্জনক। অতএব।—

কি করা উচিত!

সার্কেল অফিসার বিহারী দত্ত পাৎলুনের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরের এপাশ ওপাশ পায়চারী করতে থাকে। অস্থির। কিছুটা বিচলিত।

চৌকির খবরে দুর্দিন—অন্নবস্ত্রহীন গ্রাম।

চৌকিদারেরা শুকনো চাষাড়ে মুখে বলে, 'গ্রামে শান্তি নাই হুজুর।'

সাব-ডেপুটির মেঠো হাকিমী গ্রেড থেকে সার্কেল অফিসে এসে চুল পেকে গেল বিহারী দত্তের। তবু কেমন ভয় করে। ভয় করে—ওপরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। চোখের কোণে একবার কেরানীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—দায় দায়িত্বের কোন দুর্ভাবনার ছায়াপাত নেই সেখানে। বরং কেমন যেন চাপা হাসির ঝিলিক। হঠাৎ মনে হয়—আহা! ওই রকম নিশ্চিন্ত কেরানী হতে পারতো যদি! এই মুহূর্তে।

বিহারী দত্ত পায়চারী করে শুধু এপাশ ওপাশ। মুখে ঘাবড়ানো ভাব। সে মুখের দিকে বিব্রত চৌকিদারের দল কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে হাই তুলে চলে এল থানায়।

কিন্তু থানার ব্যাপার জঙ্গী। চৌকিদারেরা সেখানে জুজু। বাপ-মা তুলে খিস্তি খেউড়, চড়টা চাপড়টা হামেশাই জোটে। ভালতেও শালা, মন্দতেও শালা।

সেখানে ব্যাপার ঘটে চূড়ান্ত। এমনটা হয়নি আগে। চৌকিদারের দল ঘাবড়ে যায়: কি একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গেছে যেন কোথায়।

চার নম্বর ইউনিয়নের চৌকিদার ভীম মণ্ডল তার রিপোর্ট খাতার হলদে ছেঁড়া পাতাগুলো সমেত ছিটকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বারান্দায়।

চৌকিদারদের মুখ বোকা বোকা—চোখে ভয়। ফিস্ ফিস্ করে শুধোয়:

'কি হলো—এঁ্যা?'

'শালা ভবানী সাঁতরার বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে।' ব'লে ভীম

গায়ের ধূলো ঝেড়ে দলের মধ্যে এসে বসে বিরস মলিন মুখে। যেন দোষটা তারই। বললো, 'বলো দেখি তুমরা—আমি এখন কি করি!'

গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেল মেয়েটা শেষ পর্যন্ত। এক টুকরো কাপড় নেই কোমরে। তিরিশ বছরের চওড়া কাঠামোর মেয়ে একটা। ছেলেপুলের মা—ছেলে ক'টি একেবারে কচিও নয়। তার ওপরে স্বামীর প্রথম পক্ষের বিশ বছরের জোয়ান সেয়ানা এক ছেলে। এদের সামনে ঘর করে সে কেমন ক'রে উলঙ্গ হয়ে!

তারপর ···

এক নম্বর ইউনিয়নের সুবাসিনী বেওয়া। জেরা চলে তাকে নিয়ে। নিজের পেটের ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে সে।

'—খুন?' দারোগার হুংকার।

'খুন নয় হুজুর। খিদের জ্বালায় মাকে আঁচড়াচ্ছিল—কামড়াচ্ছিল। কিন্তু মুখে তার দেয় কি? কি আছে?'

এক দানার সংস্থান নেই। আবার পেটে একটি আসছে দু-এক মাসের মধ্যে। স্বামী মারা গেছে মাস সাতেক আগে। হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে সুবাসিনী গলা টিপে ধরেছিল ছেলেটার: 'চেঁচা—চেঁচা!' ছেলেটার চেঁচানি যখন থামলো তখন নিজে সে গলা ফাটিয়ে ডেকে আনল পাড়া সুদ্ধ: 'হায় হায়! আমি একি করলন গো!'—

আর মাটিতে দুম্ দুম্ কপাল ঠোকা। যেন, নিষ্ঠুর এক নম্বর ইউনিয়নের গ্রামের মাটি।

তারপর থানা পুলিসের ভয়ে গা ঢাকা দিল সে কোথায়।

'পালালো?—ছেলেটার লাস?'

'গ্রামের সবাই পুড়িয়ে দিল হুজুর। তারা বললো—একি খুন না খিদের জ্বালা!'

'শালা!'—

এক নম্বর ইউনিয়নের চৌকি পূর্বচক। চৌকিদার মধুনাথ বারান্দায় ছিটকে এসে পড়লো ভীম মণ্ডলের মতো। তারপর পাঁচ নম্বর, ছ'নম্বর, সাত নম্বর—ছিটকে ছিটকে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়তে লাগলো সবাই দমাদম। সংকট ব্যাপক।

এর মাঝখানে তিন নম্বরের গগন দাস হঠাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসে। তার তিরিশ বছরের নোকরি! থানায় গুঁতো খেয়ে গগন দাস সার্কেল অফিসে তার তকমা আর নীল কোর্তা জমা দিয়ে ব'লে এল:

'রইল হুজুর। বুড়া হয়ে পড়লাম—চোখে আর দৃশ্য হয় না।'

সার্কেল অফিসারের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। একটা হুলুস্থূল পড়ে যায়। ওদিকে জঙ্গী ঘাঁটির জঙ্গী কায়দা কানুন আরও তীব্র, আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড় দারোগার গর্জন শোনা যায়। শালা বাঞ্চোৎ!—

চৌকিদারদের মুখে বোবা ভয়। কি একটা হয়ে গেছে যেন—অথবা কিছু একটা হবে। গ্রাম গ্রামান্তরে দুর্দিন—অন্ন বস্ত্রহীন, দুর্মূল্যতা। অকলঙ্ক শরতের আকাশের তলায় ডাগর ডাগর ধান গাছগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে ঘনশ্যাম বাঁজা মেয়ের মত—নিস্ফলা। ফসলের এখনও দু-মাস বাকী। ধানের দাম আগুন—ক্ষুধার্ত চাষীর নাগালের বাইরে। এদিকে বর্ধিষ্ণু জমি-জমার মালিকের গোলা থেকে ধান বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে—গ্রাম গ্রামান্তরের নদী খাল দিয়ে। ঘুর ঘুর করছে মহাজনী নৌকো আর ফড়ে। পুরুষেরা বেকার—কাজ

খোঁজে। মেয়েরা নিরুপায়—গলায় দড়ি দেয়। হাজা শুকা নয়, দুর্ভিক্ষ নয়! পরিব্যাপ্ত নতুন এক দুর্দিন।

সার্কেল অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা পথ ধরলো গগন দাস—গ্রামমুখো।' চৌকিদাররা ছেঁকে ধরে তাকে :

'কি হলো—এঁ্যা? কি হলো তুমার? ছেড়ে দিলে কাজ!'

'শুনেছ কখনো?' গগন দাস রুখে উঠলো, 'শুনেছ—একটা ভালো মানুষ কখনো বনে বাদাড়ে তরাস খেতে ছুটে? পেটের জ্বালায়—'

পেটের জ্বালায় তরাস খেয়েছিল গগন দাসের জামাই হারাধন। মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে চাষাভুসোরা তার মরার দিনটিতে গাছের তলায় ভাত দেয় কলাপাতায় করে। ওরা তাকে বলে তরাস। সেই তরাস দেখে সন্ধ্যের অন্ধকারে শ্বশুরের ঘরের পেছনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল হারাধন। হঠাৎ জিবের তলায় জল এসে পড়েছিল তার। এক দানা ধান নেই ঘরে, জমির মালিক বন্ধ করেছে ধান দাদন—বাজারে দাম চড়া। শ্বশুরের মরা ছেলের তরাস দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। বিধবা জোয়ান বৌটা গাছের তলায় ভাত বসিয়ে দিয়ে কাঁদতে বসেছিল স্বামীর জন্যে। হারাধন অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে পাতা টেনে বসেছিল। ভূতের মতো এদিকে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে কান্না ফেলে বিধবা মেয়েটা পালালো ঘরের ভেতরে। গিয়ে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল।

'কি হলো বৌমা—এঁ্যা, কি হলো?'

'ভু—ভূ—ভূত!'

'ভূত!'

রাত বিরেতে ঘোরা চৌকিদার গগন দাস। ভূতের কথা বিশ্বাস

করতে পারে না। তবু খিড়কীর দিকে উঁকি মেরে দেখে—কে যেন সাপটে পালাচ্ছে খিড়কীর ডোবার পাশ দিয়ে গোলমাল শুনে। শুকনো বাঁশ পাতায় খর পায়ের শব্দ—সর্‌সর্‌সর্‌।

গগন দাস তাড়া করেছিল চৌকিদারী লাঠি নিয়ে। ভূত ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। লজ্জায়, অপমানে, প্রাণ ভয়েঃ শ্বশুরের মরা ছেলের তরাস!

ভূতের নাগাল না পেয়ে গগন দাস লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল তাক ক'রে। অন্ধকারে ছোটো ছায়াটা পড়ে গেল হঠাৎ যেন—তারপর আর দেখা গেল না।

দু-দিন বাদে মেয়ের গলা ফাটানো কান্না শুনে গগন দাস জানতে পেরেছিল, জামাই তার মরে গেছে। এক মেয়ে।—আদর করে বিয়ে দিয়েছিল গ্রামের ছেলে হারাধনের সঙ্গে, চোখের সামনে থাকবে। খাটিয়ে জোয়ান ছেলে হারাধন—সুখে থাকবে চঞ্চলা। কিন্তু অতো খেটেও সেই নেই নেই। বছরের খোরাক কুলোয় না। অথচ ক্ষেত ভ'রে ধান হয়, লক্ষ্মী যেন উছলে পড়ে মাঠে মাঠে।

গগন দাস আফশোস করেছিল, 'সময় থাকতে খবরটা দিলিনি একবার মোকে।'

চঞ্চলা ভেজা ভেজা গলায় বলেছিল, 'সে যে বারণ করেছিল। ভালো মানুষটা গেল ধানের খোঁজে। ফিরে এলো বুক ঘষড়ে ঘষড়ে—গামছায় বাঁধা ভাত। বললো—পেট ভরে খা তোর ভায়ের তরাস!'

তরাস। আর ভূত। গগন দাস থ মেরে বসে থাকে। মেয়ের কাছে ফাঁস করে না আর কিছুই। তবু মনে মনে জ্বলে: শেষে সেই

মেরে ফেলল হারাধনকে। খুন করল সে? মনে মনে গুমরে মরেছে গগন দাস। এ-খুন না খিদে? কি রিপোর্ট করবে সে থানায়? তার সাধের চঞ্চলার স্বামী হারাধন মরে গেল অপঘাতে।

শেষ পর্যন্ত বুড়োটে শক্ত গলায় থানায় রিপোর্ট দিল এসে, পেটের জ্বালায় মরে গেল হারাধন।

'শুনেছ কখনো এসব হাল?—মানুষ ভূতের মতো এসে তরাস খায়?' তারপর কেঁদে ফেলে হাঁউমাউ করে, গ্রামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—'গগন দাস অনেক পাপ করেছে, অনেকের চোখের জল ঝরিয়েছে। তাই তার ছেলে গেল, জামাই গেল—নির্বংশ হলো। হ্যাঁ—মানি, অনেক পাপ করেছি আমি। আর জমির মালিকরা—তারা যে ধান দাদন দিল না চড়া বাজারের লোভে? দারোগা বলে আবার, পেটের জ্বালায় মরেনি, রিপোর্ট দে—বৌয়ের চরিত্তির খারাপ ছিল তাই বিষ খেয়ে মরেছে। মোর মেয়ের চরিত্তির খারাপ?'

বুড়ো গগন দাসকে ঘিরে নীল কোর্তার ভীড়। বোকাবোকা, ভয় পাওয়া।

ভীম মণ্ডল ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'মোকেও জিজ্ঞেস করেছিল—ভবানী সাঁতরার দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে তার জোয়ান সেই সৎ ছেলেটার খারাপ কোন সম্পর্ক ছিল কি-না। বলে কি—স্বামীটা তো বুড়ো!—হতে পারে। ছোটলোক তো!'

'তোবা তোবা।' তিন নম্বর ইউনিয়নের রমজান বলে উঠলো, 'হাজার হোক—বাপের সাদি করা বৌ। মা।—জননী!'

'ব্যাপার দেখে শুনে শেষমেস আমি বললাম', বেঁটে ছোকরা মতো একজন বলে উঠলো, 'মোর কোন খবর নাই হুজুর। মাঠে ধান

গাছ চেড়ে এক গলা হয়ে গেছে। আর জোর মাস খানেক—ধান উঠে যাবে। বাস্। মোকে কিছু আর বললো নি।'

'মর শালা—নির্বংশ হ।' গগন দাস অভিসম্পাত দিল। কাকে দিল বোঝা গেল না।

বেলা শেষ হয়ে এলো। চৌকিদারেরা ছোট ছোট দলে পথ ধরেছে গ্রামের। জনা চারেকের নীলকোর্তা পরা একটি দল সোজা এগিয়ে চলেছে সড়ক ধরে। এক অঞ্চলের লোক। মাঝখানে খালি গায় শুধু গগন দাস। সবাই কথা কইছে। বুড়ো গগন শুধু চুপ। কি যেন ভাবছে। হঠাৎ কি একটা হয়ে গেল যেন।

পায় পায় ছোট দলটি হেঁটে এলো বহুদূর। এসে থামলো খেয়া-ঘাটে। নদী পেরোবে। পাকা সড়ক, দালান কোঠা, বাজারগঞ্জের বৈচিত্র শেষ হয়ে গেল এপারে। ঘাড় বাঁকা গোঁয়ার মেয়ের মতো খরবেগ এক নদীর খাড়া পাড় বেয়ে উঠে ওপারে মহাল নদীচর। মাইলের পর মাইল ছুটে যাও—একটি ভাঙা ইটের টুকরাও পড়বে না চোখে। শুধু দিগন্তবিসারী ধানবন। ঠাণ্ডা। নিঃশব্দ।

দল ভেঙে গেছে। নদী পেরিয়ে চারজন চলে গেল চার মুখো। গগন দাস পথ চলেছে অন্য মনে—বুড়ো বুড়ো পা ফেলে। লম্বা চওড়া চেহারাটা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে একটু। হাতে লম্বা লাঠি। ভেড়ি বাঁধের দু-পাশে ধানবন—ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। তার মেয়ের মুখের মতো। শান্ত। ঘনশ্যাম।

... কাঁচা বয়সে মেয়েটা বিধবা হয়ে গেল।

বুকভরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো গগন দাস। ছেলে মরে যাওয়ার পর অনেক কথা ভেবে রেখেছিল সে—আশা আশ্বাসে ভরা বুড়ো

বয়সের সুখ শান্তির কলরবে মুখরিত সংসার একটু। আর বেশী কিছু না।

ভেড়ি বাঁধের একটা বাঁক ঘুরতেই অন্যমনস্ক গগন থমকে দাঁড়ালো। তাকে দেখে হঠাৎ কে যেন ভেড়ি বাঁধ থেকে নেমে সর সর করে নেমে গেল ধানবনের মধ্যে। পুরানো চৌকিদারী গলায় হেঁকে উঠলো গগন:

'কে রে!'

কোনো সাড়া নেই আর।

'দেবো লাঠি পিটে—বেরিয়ে আয়।' গগন এগিয়ে গেল। তিরিশ বছরের কড়া হুঁশিয়ার লোক।

সুবাসিনী ধরা পড়ে গেল শেষকালে পাঁচ দিন পরে। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো ধান বনের ভেতর থেকে। যেন বুনো মানুষ একটা। শুধু উঁচু পেটটার ওপরে জড়ানো ছেঁড়া কাপড় একটু। হাতে একটা পুঁটলি।

পুরানো অভ্যাস বসে গগন হাত বাড়ালো আগে পুঁটলিটার দিকে, 'কি আছে ওতে—দেখি।' — বলেই সে হাতটা সরিয়ে নেয়। মনে পড়ে যায় হঠাৎ, উর্দি আর তকমা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে আজ সে। তিরিশ বছর পরে। ও আর ছোঁবে না।

সুবাসিনী কাঁপতে কাঁপতে পুঁটলিটা খুলে ধরলো গগনের সামনে— ছেঁড়া কাপড় একখানা, ক্ষয়ে যাওয়া কালচে পড়া রূপার পৈঁচা এক জোড়া। একটা শামুক। পথে বিপথে ছেলে হলে নাড়ি কাটবে। দিশী দু-একটা ওষুধ শেকড়-বাকল—ছেলে হওয়ার পর শরীর গরম রাখার জন্যে।

গগন চেয়ে চেয়ে দেখছে। সুবাসিনী সে চোখের দিকে চোখ তুলে একবার তাকাতেও সাহস পাচ্ছে না। ধরা পড়ে গেছে সে।

গগন বললো, 'কোথায় যাবি?'

সুবাসিনী এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো শুধু, 'জানিনি।'

'তবে? ভারি মানুষ তুই! এখন যাচ্ছিলি কোথায়?'

'ঠিক নাই'

ঠিক নাই। ঠিকানা নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনঘোর হয়ে আসছে গ্রাম গ্রামান্তর জুড়ে। নারিকেল আর তাল বনের চিহ্ন আঁকা গ্রামগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সেই অন্ধকারে। শরতের প্রশান্ত সন্ধ্যায় মাঠের মাঝখানে ভেঁড়ি বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে চঞ্চলার কথা মনে পড়ে যায় গগনের।—মেয়েটার বিনিয়ে বিনিয়ে সেই চাপা কান্না।

'যা—পালা, থানা পুলিস হবে। বুঝলি? পালা।' গগন বললো আস্তে আস্তে।

সুবাসিনী আবার পুঁটলি বাঁধে। হাত কাঁপে তার।

তাকে পেছনে ফেলে গগন এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে। তিরিশ বছর পরে একটি অপরাধীকে ছেড়ে দিল সে। যাক, জ্বালা ধরা মনে কেমন প্রশান্তি আসে হঠাৎ। তকমা আর নীল উর্দিটা জমা দিয়ে এসেছে সে চিরদিনের জন্যে। আর কোনো দিন সে দক্ষিণ মুখো যাবে না—খেয়া পার হবে না।

কয়েক পা এগিয়েই সে থমকে দাঁড়ালো। ঘুরে দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগলো সুবাসিনীকে—তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে গ্রামে, আশ্রয় দেবে নিজের ঘরে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কোথায় যাবে গ্রামের

মেয়ে একটা এমন দুর্দিনে! গগন দাস পাগলের মতো মাঠময় খুঁজে বেড়ায় সুবাসিনীকে। তারপর তাকে সঙ্গে করে ফিরে এলো গ্রামে। কৌতূহলী গ্রামের মানুষের মুখের দিকে চেয়ে বুড়ো বললো :

'ফিরিয়ে আনলাম ওকে। কোথায় যাবে বল? ও রইলো মোর মেয়ার মতো। থানা পুলিস হলে তুমরা কেউ বলোনি ওর কথা। কি বল?'

'ঠিক কথা চৌকিদার। ওর দোষ কি? ক্ষিদার জ্বালা বড় জ্বালা গো! ওর দোষ কি?'

'তবে থাক বেটি।—কোথায় যাবি!' বুড়ো মুখটা গগন দাসের অদ্ভুত দেখায় হাসিতে—আনন্দে! পরিতৃপ্ত।

'হাঁ, থাক।' গ্রামের মানুষের গভীর গলার আশ্বাস : 'মোরা তো আছি।'—

কিন্তু ওপারে চাঞ্চল্য। দিন কাল খারাপ। ক্ষুধার্ত গ্রামগুলো মরিয়া।

থানা সার্কেল অফিস ঘিরে পাশাপাশি আরও গুটি কয়েক সরকারী অফিস আছে—ঋণ সালিশী বোর্ড, পোস্ট অফিস, সরকারী ডাক্তারখানা ইত্যাদি। সব গুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সিকি মাইলের মধ্যে এক আধা শহুরে পত্তন—দালান কোঠার ভিড়, গ্রামের জোত-জমির মালিকদের আস্তানা। সেখানে একটা কথা ঘোরে মুখে মুখে লাগাম ছেঁড়া পাগলা ঘোড়ার মত : গ্রামের চৌকিদাররা তকমা আর উর্দি ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে। অফিসারদের মুখের ওপরে। গঞ্জবাজারে, দালান-কোঠার বৈঠকে, ঘুপটি মারা ছোট-ছোট চা-খানাগুলোয় গুজবের গাঁজলা ওঠে। দিনকাল বড় খারাপ। নদীর ওপারের মরিয়া গ্রামগুলো কিছু একটা

ক'রে বসবে। সাংঘাতিক। নির্মম। খুন করে লাস পুড়িয়ে দিচ্ছে তারা বে-মালুম। একজোট হয়ে খুনীকে দিচ্ছে আশ্রয়। নোকরি ছেড়ে চৌকিদাররা জুটছে গিয়ে তাদের সঙ্গে। হাজার রকমের কথা ভয়াবহ হয়ে ওঠে দিনে দিনে।

বিহারী দত্ত বদলীর আবেদন ক'রেছিল গোপনে—কেরানীরা তা-ও ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

সবটা কেমন নড়বড়ে। থমথমে মনে হয় হঠাৎ। মনে মনে ওৎ পেতে আছে বিহারী দত্ত—বদলীর হুকুমটা এলে হয়!

থানা অফিসার হেসে বললো, 'চলে যাচ্ছেন নাকি শুনলাম?'

'হুঁ! পেট খারাপ। মানে এখানকার জলে হজম হচ্ছে না ভালো। অতি বাজে, এঁদো জায়গা।'

'লোকগুলোও ভালো না। কি বলেন?' কথাটা বাঁকা ভাবে বলে হাসলো দারোগা।

বিহারী দত্ত কিন্তু কথাটাকে লুফে নিল অন্য ভাবে। আবেগে বলে উঠলো, 'ঠিক ধরেছেন, সাংঘাতিক লোক। থানা ভাঙে, ডাক লুঠ করে—অফিসারদের ধরে ধরে দ্বীপান্তর দেয়। সে একেবারে কোথায়! —সুন্দরবনে। সুন্দরবন থেকে ঘুরে ঘুরে কলকাতা গেছি মশায় একবার—একবস্ত্রে, জানেন? চুপ করে থাকতে থাকতে এমন কাণ্ড করে বসে হঠাৎ! সাংঘাতিক!'

ঘরপোড়া গোরু।

দারোগা হেসে বললো, 'ঘাবড়াবেন না।'

তবু ঘাবড়ায় বিহারী দত্ত, ঘাবড়ায় জোত-জমির মালিকরা। ক্ষুধার্ত গ্রামগুলো কিছু একটা করে বসবেই।

মানুষ খুন ক'রবে, গোলা লুঠ ক'রবে, গ্রামে ঢুকতে দেবে না। হয়তো থানা ঘেরাও করবে। মিছিল ক'রে আসবে নদী পেরিয়ে—গুলির পরোয়া করবে না। এর মধ্যে কয়েক জন চাষী এসেছিল ঋণ-সালিশী বোর্ডে। সর্বশান্ত হয়ে দলিল-পত্র সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে সড়ক দিয়ে যেতে যেতে চোর বলে গাল দিয়ে গেছে স্বদেশী-রাজের বিচারকে—মালিক মহাজনের জাতকে। জোত-জমির মালিকদের চোখে ভয়। একমাত্র ভরসা জঙ্গী ঘাঁটি থানা :

'ব্যাপার যে গুরুতর—কিছু একটা করুন মশাই !'

দারোগা হেসে বললো, 'হলো কি যে করবো কিছু।'

'কি সব শুনছি !'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় কি ?'

'ওদিকে সব লুঠ হয়ে যাক—জমি, ধান, কারবার !'—

'মগের মুলুক ! থানা পুলিস মরে গেছে নাকি !'

'পুলিস যদি গুলি না করে ? তেমনও তো হচ্ছে !'

তেমনও হচ্ছে। দিনকাল খারাপ। বিশ্বাস টলছে। আতঙ্ক বাড়ছে। আর অজ্ঞাতপূর্ব কি একটা গড়ে উঠছে যেন দুর্জ্ঞেয় ওপারের মানুষের মধ্যে। সিকি মাইল ব্যাপী আধা-শহুরে জায়গাটুকু কিছু একটার আশঙ্কায় থমথম করে। জটলা হয়। এক কথা : নদীর ওপারে কি যেন হয়ে যাচ্ছে অজ্ঞাতে। কজন অচেনা মানুষ খেয়া পেরিয়েছে কবে, মরিয়া নোংরা মানুষের দল মাতব্বরদের নিয়ে সমিতি গড়ছে—পথ খুঁজছে। ক'জন চৌকিদার নাকি আরও মতলব আঁটছে ওপারের—তক্‌মা উর্দি ছুঁড়ে দিয়ে যাবে মুখের ওপরে।

চৌকিদাররা শ্রান্ত বিষণ্নমুখে দল বেঁধে আসে এপারে হাজিরা

দিতে। গগন দাসের মতো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তক্‌মা উর্দি কেউ ছুঁড়ে না ফেললেও—কোনো আশ্বাস নেই তাদের চোখে মুখে। কেমন পিট্‌পিট্‌ ক'রে তাকায় সবাই : চেপে চেপে যেন কথা বলে। কম কথা বলে। তাদের মুখে শুধু অন্নবস্ত্রহীন গ্রামের কথা—ব্যাপক সংকটের কথা। আর, কোন খোঁজ নেই খুনী সুবাসিনীর। কোন খোঁজ নেই গগন দাসের। সবটা চাপা চাপা।

হঠাৎ একদিন আরও নতুন এক খবর ছড়িয়ে পড়লো : কোন জোতদারের গোমস্তা খাজনা আদায় করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে এপারে। ফেলে আসতে হয়েছে ওপারে তার ভোজপুরী পাইককে।

শেষ পর্যন্ত জঙ্গী ঘাঁটির টনক নড়লো।

দারোগা হেসে সার্কেল অফিসারকে বললো, 'পাখী শিকার করতে যাবেন নাকি?'

বিহারী দত্তের বদলীর হুকুম আসেনি—মন খারাপ। বৌ-ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে দেশে তাড়াহুড়ো ক'রে। কোনোরকমে মুখে একটু হাসি টেনে বললো, 'কোথায়?'

'নদীর ওপারে!'

'আপনি যান—আমার কাজ আছে। জরুরি কাজ।'

বেশী কথা কয় না। ফাইলের মধ্যে বিবর্ণ মুখ লুকালো বিহারী দত্ত।

নদীর ওপার। নোংরা মানুষ—ক্ষুধার্ত আর হিংস্র। জঙ্গল-জালপাই। দুঃস্বপ্নের মতো।

একদিন বিকেলের শেষ খেয়ায় পার হলো একদল পুলিস ফৌজ। ঘাঁটি গাড়লো গ্রাম ঘিরে। রাত্রির অন্ধকারে।

বুনো গ্রাম। অন্ধকারে মনে হবে বিভীষিকার মতো। একটি আলোরও চিহ্ন নেই দিগন্ত পর্যন্ত। প্রশান্ত নির্মেঘ শরতের আকাশের তলায় পাৎলা অন্ধকারের একটা ভূখণ্ড—মাঝে মাঝে গাদাগাদি টঙের মতো কুঁড়ে, দূর থেকে মনে হবে ছোট ছোট যাযাবর বেদের তাঁবু। যেন ওঠ বললেই ওঠো। জন-কলরবহীন। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটি ভাগাড়ে কুকুরের ডাক কাঁপে অন্ধকারে। ভুল হবে, বুনো গ্রামের কান্নার মতো।

তারপর শেষ রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একটা হল্লা ওঠে আকাশে—আর্তনাদের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে। ঘুম-চোখে বিছানা থেকে টানা হেঁচড়া হয়ে ক্ষুধার্ত নোংরা মানুষগুলো চায় বোকা বোকা চোখেঃ ফেরারী! খুনী!

'বাঃ! খুনী কে!'

তারপর বন্দুকের কুঁদোর গুতোয় দম চাপা গোঙানী আর হাওয়ায় বেপরোয়া গুলির পট্‌পট্ শব্দ, মেয়েলী গলার কান্না আর বাচ্চা ছেলের আর্তনাদ। ঘুমন্ত গ্রাম জেগে উঠে সবটা ভালো ক'রে বোঝাবার আগে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অতর্কিত আক্রমণে। ধরা পড়ে গেছে প্রথম ধাক্কায় কয়েকজনা। মার খাওয়া মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে কোনরকমেঃ

'খুনী! আমরা কি জানি!'

'চৌকিদার গগন দাস? কোথায়?'—

'জানিনি।'

'সুবাসিনী?'

'জা-নি—নি।' অবসন্ন গলার শেষ গোঙানী কাৎরে কাৎরে ওঠে এখানে ওখানে।

পাত্তা নেই সুবাসিনীর, পাত্তা নেই গগন দাসের। অতবড় ভোজপুরী পাইকটার চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। সারা গ্রামটাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘিরে চষে ফেললো বুটে, বেয়নেটে, গোঙানী আর আর্তনাদে।

কুঁড়েগুলো সব খালি। ভাঙা হাঁড়ি-কুঁড়ি—ভাঙা ঘর-সংসার। ছাই পাঁশ আগুন। তার ওপরে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে কুৎসিত বিভীষিকার মতো।

সেই উষ্ণ আলোর দিকে একটু ঘেঁষে বসলো সুবাসিনী। ঝোপের গাছ পালার আড়াল দিয়ে রোদ এসে পড়েছে একটু।

ছেলেটা কেঁদে উঠলো হঠাৎ নাড়া খেয়ে।

'ওঁয়া—ওঁয়া।'—

কাছাকাছি শিকার ধরা পড়ার উল্লাস উঠলো যেন। কাছাকাছি বুটের শব্দ। হল্লা এগিয়ে আসছে। ছেলেটার মুখে মাই গুঁজে দিল সুবাসিনী তাড়াতাড়ি। হঠাৎ নাড়া খেয়ে আরও জোরে ওঠে কান্নার শব্দ। হল্লা বাড়ছে। খুব কাছে।

সুবাসিনী হাত চাপা দেয় এবার ছেলেটার মুখে। দম বন্ধ হয়ে কাঁপছে ছেলেটা থরথর ক'রে, হাত-পা ছুঁড়ছে—নীল হয়ে উঠছে কচি কচি মুখটা। সুবাসিনী চেয়ে আছে সভয়ে। দম আটকে আসছে দম আটকে মরা সেই ছেলেটার মতো। এখুনি হয়তো থেমে যাবে সেই রকম। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কাঁপতে কাঁপতে। মরা ছেলের মুখটা ভেসে ওঠে একবার চোখের সামনে। হাত ছেড়ে দিল। তারপর ফুঁপিয়ে উঠলো সে নিজেই। ঠাণ্ডা ঝোপের অন্তরাল থেকে বাইরে সূর্যের আলোয় দমকে দমকে ছড়িয়ে পড়ে তাজা শিশু কণ্ঠের কান্না।

তারপর সুবাসিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা মুখে যখন চোখ তুলে তাকালো তখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দু-জন ফৌজ, পাথর মুখ। খুনী সুবাসিনীর মুখে খুন হওয়ার আতঙ্ক।

রোদে ঝকমক করছে বেয়নেট। পেছনে চৌকিদার মধুনাথ।

'এ কে ?'

মধুনাথ জবাব দেয় না কোনো।

'কে ? নাম কি এর ?' চড়া গলার হুংকার।

বেয়নেট তার বুকের কাছে। তোতলার মতো মধুনাথ বললো :

'সুবাসিনী বেওয়া।'

জান্তব গর্জনের মতো একটা উল্লসিত হল্লা ঝোপের ভেতর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে যায় আকাশে।

'ওঠ্।'—

টেনে তুললো দু-জন একটা ঠাণ্ডা কাঁপা উলঙ্গ নারী দেহকে। কাটা রক্তাক্ত ঠোঁটে শেষ রাত্রির প্রসব-বেদনা চাপার ভয় পাওয়া চিহ্ন। রক্তের দাগ তখনও শুকোয়নি শিশির ভেজা মাটি থেকে।

'চল্। গগন দাস কোথায় ?'

পেছনে ধাক্কা। সুবাসিনী টলতে টলতে এগোলো দু'পা। তারপর পড়লো হুমড়ি খেয়ে। একটা খোঁচা খাওয়া জানোয়ারের মতো ককাতে লাগলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে।

'ওঠ্ ওঠ্—চল্।'—

দুটো সঙ্গীনের ফলা উঁকি মারছে মুখে, পেটে।

গ্রামের মাটিতে মুমূর্ষু কান পেতে শুনলো সুবাসিনী—কে যেন ভয় পাওয়া গলায় এসে বললো : সবগুলো পারানী নৌকো ডুবিয়ে

দিয়েছে কারা যেন।—একটাও নেই।—কারা যেন ছুটে গেল। দ্রুত—শঙ্কিত। আহা, ছেলেটা কাঁদছে এখনও কোথাও। কেউ কি শুনতে পাচ্ছে না!

ঢো[illegible]শ

গ্রামের লোকালয় থেকে বহুদূরে মাঠের মাঝখানে বৌ-হারানীর জলা। গ্রাম থেকে ভাঙা-চোরা একটা ভেঁড়ি বাঁধ এঁকে বেঁকে চলে গেছে মাঠের মাঝখান দিয়ে। শেষ হয়েছে গিয়ে মজে আসা পদ্মদীঘির পাশে।

দীঘির পাড়ে মালিকের জালপাই মহালের চাষঘর। ভুতুড়ে কুঁড়ে একটা জনমানব শূন্য তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে, গুটিকয়েক বুড়ো বট আর অশথের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে দোর্দণ্ড প্রতাপ মালিকের প্রহরীর মতো। গোমস্তা তহশীলদার কেউ থাকে না সেখানে। তবু যেন সূর্যের উদয়-অস্তের নিয়মে চাষীরা জলায় গিয়ে নামে বছরে দু'বার : একবার ফসল বুনতে, আর একবার ফসল তুলতে। তারপর সারা বছরের মধ্যে কেউ আর যায় না সেদিকে।

দীঘির পাশে মথুরা দাসের জমি। জোয়ান এক ছেলে সুদাম, আর একটি গোরু নিয়ে জমি চষতে এলো মথুরা দাস।

দীঘির পুবকোণের সাতকাঠা জমির ওপরে লাঙল সাজাতে সাজাতে মথুরা গদগদ গলায় ব'ললো, 'ফি সন এই জমি থেক্যাই চাষ আরম্ভ করি—এ মোর বড় পয়মন্ত জমি গো।'

'ভারী তুমার পয়মন্ত!' সুদাম গজ গজ ক'রে ব'ললো, 'তিন বছর আছে তো ফসল-বন্ধকে। নিজের জমির ধান, চাষ করে তুলে দাও মহাজনের গোলায়!'

মথুরা ব্যথিত কণ্ঠে ব'ললো, 'তবুতো এ মোর নিজের জমি। কি করি তখন অকালে টানের সময়! তবু তোর মা মরল—মুখে তার একটু ওষুধ দিতে পারিনি।'—

তারপর একটি গোরুর কাঁধে একপাশের জোয়াল তুলে দিয়ে মথুরা ব'ললো, 'তুই তবে লাঙল ধর—আমি টানি।'

সুদাম বিরক্তি ভরা গলায় ব'ললো, 'তুমি বুড়া লোক পারবনি। আমি বরং টানি—তুমি লাঙল ধর।'

এক পাশের জোয়াল গরুর কাঁধে—আর একপাশ সুদামের কোমরে বাঁধা। মথুরা দাসের চাষ শুরু হ'লো। মথুরার পাশাপাশি জমিগুলি সব চাষীরা আগেই চষে চলে গেছে, তার মতো পেছিয়ে পড়া দু-চার জন চাষী শুধু দূরে দূরে মুখ নীচু ক'রে লাঙল ঠেলছে। তাদের মধ্যে থেকে কে একজন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো:

'হেই ··· সাবাস্—সাবাস্। মথুরা দাসের লাঙল চল্‌ল গো —হাওয়া গাড়ী।'

সেদিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে সুদাম মুখ নীচু ক'রে জোয়াল টেনে চললো। তারপর হঠাৎ একটা মেয়েলী গলার হাসির শব্দে সে মুখ তুলে তাকালো দীঘির পাড়ের ওপরে সেই ভুতুড়ে কুঁড়ে-টার দিকে। হাসির শব্দটা ভেসে এলো সেই দিক থেকে।

কিন্তু ওখানে মেয়েমানুষের গলা! আবাক হ'লো সুদাম। ঘরের ভেতর থেকে তখন রাজেশ্বরীকে বাইরে টেনে এনেছে কলমি:

'গ্যাখ্ গো মা!'

বুড়ী কিন্তু হাসলো না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো, 'তোর বাপকেও এক বছর অউ রকম চাষ করতে হৈছে গো। ভাগ-চাষীর কপাল মা—অউ রকম গোরু-মানুষে তবু আধখানা।'

রাজেশ্বরী পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো মথুরার জমির দিকে।

সুদাম এবার ফেটে পড়লো বাপের ওপরে, 'কপালে তুমার শনি লাগছে। বুঝল? তা না হৈলে চাষীর গোরু মরে!'—

মথুরা চুপ ক'রে রইলো—চুপ ক'রেই ঠেলে গেল লাঙল।

রাজেশ্বরী এসে দাঁড়াল দীঘির পাড়ে মথুরার জমির পাশে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে—মুখে তার আলাপ করবার, কথা কইবার ইচ্ছা। কিন্তু বাপ-বেটার কেউই মুখ তোলে না। কথা কয় না। লজ্জায়।

তবু রাজেশ্বরী গায়ে পড়ে কথা কয়। ব'ললো, 'হালের গাঁতা কি হৈলনি—মানুষ দিয়া লাঙল টান?'—

মথুরা মুখ না তুলেই আপশোস করে ব'ললো, 'গেরামে জোড় ভাঙা হালের গোরু কারো নাই গো। তবু গেরামে দশঘর চাষী হালের গাঁতায় চাষ করে—শুধু, মোর কপালে জুটলনি।'

সুদাম আবার খেঁকরে উঠলো সুযোগ পেয়ে, 'তুমার কপালে শনি লাগছে—শনি। অমন গোরুটা মরে গেল!'

তারপর কেউ আর কোনো কথা বলে না—রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে গেল। বাপ ছেলেতে লাঙল আর জোয়াল টানে জলে কাদায়। মথুরা মাঝে মাঝে শুধু হুঁশিয়ারী দেয় সুদামকে গোরুর মতো:

'সোজা চলু—সোজা।'—

কিন্তু লাঙল বেঁকে যায় একদিকে টানা হয়ে—পা যেন পড়ে কোথায়। সুদামের চোখ খুঁজে খুঁজে কখনো গিয়ে পড়ে পদ্মদীঘির ঘাটে, কখনো ভূতুড়ে সেই কুঁড়েটার পাশে : একটি রোগা ছিপছিপে মেয়ে যেখানে তাকিয়ে ছিল সকৌতুকে।

মথুরা দাসের চোখে এটুকু এড়ায় না।

সন্ধ্যের আগে লাঙল চষা শেষ হলো মথুরার।

সুদাম কোমর থেকে জোয়াল খুলতে খুলতে বিরক্তি ভরে বলে উঠলো, 'সারাদিন মাঠে লাঙল টেনে অখন গিয়া আবার রাঁধা! পারবনি আমি। বাস্। পারবনি।'

'তো আমি কি লাঙল ঠেলিনি?' বুড়ো খেঁকরে উঠলো সমানে।

'শালার ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাই যে দিকে দু'চোখ যায়।'

মথুরা একমনে গোরুর কাঁধ থেকে জোয়াল খোলে। লাঙল গোছায়। কি যেন ভাবে। ঘর-সংসারের কথা হয়তো। ঘরে কোনো মেয়েলোক নাই। ছেলের মেজাজের ওপরে নিজের আর মেজাজ দেখাতে ইচ্ছে করে না। আস্তে আস্তে বলে :

'বেশ, আমিই আজ রাঁধব।'

বুড়ো মুখ ভার ক'রে কাঁধে লাঙল জোয়াল ফেলে গরুটি নিয়ে ঘরের পথ ধরলো। সুদামের দিকে আর ফিরে তাকালো না। কিন্তু মনে মনে ঘোরে তারই কথা : সে জমি চায়—গরু চায়—বৌ চায়। তার চোখে দুরন্ত কি একটাকে যেন ফুটে উঠতে দেখেছে মথুরা বহুদিন। আজও দেখেছে। যার সামনে বুড়ো নিজেকে

ভয়ানক অসহায় মনে করে। ভয় হয়ঃ হয়ত কোনদিন সত্যিই তাকে ছেড়ে চলে যাবে সুদাম।

সুদাম গোঁ ভরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ দীঘির পাড়ে। তারপর খড়ের বেণী পাকানো মুটিটা একবার নেড়ে দেখলো—বৃষ্টিতে ভিজে আগুন নিভে গেছে। ভয়ানক তামাক খেতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। কাঁপুনি আসছে জলে ভিজে ভিজে। এক পা এক পা ক'রে এগোলো সে দীঘির পাড়ের সেই কুঁড়েটার দিকে।

'একটু আগুন দিতে পার, তামুক খাব।'

সুদামের সামনে সেই রোগা ছিপছিপে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে থতমত খেয়ে। চোখে-মুখে নেই তার সারাদিনের চেনা সেই কৌতুক। হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর মনে হয় মেয়েটাকে সুদামের।

অচেনা গলার শব্দে রাজেশ্বরী বেরিয়ে এলো বাইরে। সুদামকে দেখে ভয়ানক খুশি হয় বুড়ী। তাকে আদর ক'রে ডেকে বসিয়ে ব'ললো, 'লাঙল করা শেষ হৈল বাবা?'

'আজকের মত শেষ।'

রাজেশ্বরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো, 'আমারও চাষ-বাস ছিল গো—আজ হৈয়া পড়ছি পথের ভিখারী। মালিকের চাষঘর চৌকি দেই সারা বছর, কিন্তু একটা মুঠা খোরাকি দেয়নি। বলে—চলিয়া যাইতে পার। নিজের কথা ভাবনি—ভাবনা মোর এই মেয়াটির জন্য।'

সুদাম কলমির দিকে ফিরে তাকালো।

রাজেশ্বরী ব'ললো, 'বয়স হৈল সতর—কিন্তু একটা ঘর-বর জুটলনি। মালিকের গোমস্তা হারাধন আজ মোর উপায় নাই

দেখে বলে—মেয়াটাকে দে, চরে রইবে—সুখে রাখব।—তা না হৈলে পথ ভ্যাখ। কি যে করি!' ...

কলমি হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'তুমি ভাগে জমি ধর মা—আমি তুমার চাষ করব।'

রাজেশ্বরী ব'ললো, 'মেয়ামানুষকে কে জমি ভাগে দিবে মা!'

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অতীত দিনের গল্প করে রাজেশ্বরী—যখন স্বামী তার বেঁচে ছিল, ছিল চাষবাস গরু। তারপর স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকে হাতে উঠেছে শেষকৃত্যের জন্যে ভিক্ষের যে-ঝুলি—তার শেষ আজও হয়নি।

বুড়ী ম্লান গলায় ব'ললো, 'পড়ে আছি মাঠের মাঝখানে—একটি গাই গরু আছে, আর আছে এই মেয়াটি। কিন্তু কবে যে হারাধন গোমস্তা এসে পড়বে!'—

কথা বলার লোক পেয়ে রাজেশ্বরীর কথা আর থামে না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেক্ষণ। সুদাম বিদায় নিয়ে উঠলো। আর ভাল লাগছে না তার।

যাওয়ার সময় রাজেশ্বরী ব'ললো, 'মানুষের সাথে একটু কথাও কইতে পাইনি, কেউ আসেনি এই তেপান্তরে বাপ্।'

সুদাম শেষ একবার তাকালো কলমির দিকে। তার চোখ কি একটা শোনবার জন্য যেন অপেক্ষা করে আছে গভীর নিঃশব্দে।

সুদাম বললো, 'আজ চলি—আবার আসব।'

রাজেশ্বরী খুশিতে বিচলিত হয়ে পড়ে। ভাঙা গলায় বললো, 'এস, বাপ্—এস। কেউ আসেনি এদিকে!'

সুদাম দীঘির পাড়ে এসে যখন দাঁড়ালো তখন বর্ষার প্রথম প্রহরের

রাত্রি ব্যাং আর ঝিঁঝির ডাকে বৌ-হারানীর জলায় ঘনঘোর হ'য়ে উঠেছে। দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে আজ তার প্রথম মনে হ'লো, গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন এই জায়গাটা কত দূরে! তবু আজ সে যেন অবাক হ'য়ে গেছে—ভালো লেগেছে।

ধীরে ধীরে চাষের কাজ শেষ হ'য়ে এল মথুরার। রোয়ার কাজে বুড়ো মানুষ মথুরা—বেশীক্ষণ ঝুঁকে থাকতে পারে না। বেলা-বেলি মাঠ থেকে উঠে বাড়ী চলে যায়। সুদাম ঝুঁকে ঝুঁকে ধানের চারা পোঁতে, আল বেঁধে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে জমির টুক্‌রোগুলোকে ঝক্‌মকে ক'রে তোলে। তারপর সন্ধ্যে বেলা ঘরে ফেরার আগে দীঘির পাড়ের সেই ভূতুড়ে কুঁড়েটার দাওয়ায় বসে তামাক খায়—গা গরম ক'রে বাড়ী ফেরে।

সারা দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ গিয়ে পড়ে তার দিঘির পাড়ের এক ফালি রবিখন্দের জমিতে। কলমি সেখানে সারা দুপুরটা ছোট একটা কোদাল নিয়ে কাজ করে: ঘাস নিড়োয়, নূতন গাছ বসায়। লাউ-কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স।

সেদিন এসে দাঁড়ালো সে সুদামের জমির পাশে। ব'ললো, 'কোদালটা একবার দিব তুমার?'

সুদাম তার হাতের কোদালের দিকে একবার চেয়ে বললো, 'এ মস্ত ভারী কোদাল—এতে কাজ করতে পারবিনি।"

'পারব।'

রোগা মেয়েটার চোখে কেমন একটা অদ্ভুত বেপরোয়া সবলতা।

সুদাম তবু বললো, 'চল কি করতে হবে। এ কোদাল তুলতে পারবিনি।' বলে সুদাম তার সঙ্গে সঙ্গে এগোলো।

যেতে যেতে কলমি বলে উঠলো হঠাৎ, 'দিদিটা বেশ সুখে আছে। স্বামী তার দশ বারো বিঘা জমি ভাগে চাষ করে। দেড় কাঠা বাস্তুভিটা, একজোড়া হালের গোরু।'—

সুদাম একটু হেসে ব'ললো, 'তাতে সুখ কি? বছরের খরচও তো কুলায়নি বোধ হয়। মোর ঘরে তো হয়নি। কার্তিকের টানে সেই নাই নাই।'

কলমি মাঠের দিকে চেয়ে ব'ললো, 'যার আছে সে আরও চায়। মোর মাকে যদি কিছু জমি কেউ ভাগে দিত! গাইটা আছে—চার মাসের গাভিন—হয়তো তার একটা আঁড়িয়া বাছুর হবে।'

'নাও তো হৈতে পারে?'

সে-কথা যেন শুনতে পেল না কলমি, শুধু কথার পিঠে কথা সাজিয়ে যায়।—যা হলে ভালো হতো। দিদির ঘর সংসারের কথা বলে, সুখ-শান্তির কথা বলে। সবটা বলে সে মুগ্ধ—আচ্ছন্ন গলায়। তেমনি আচ্ছন্ন ভাবে দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে সে তার নিজের কথাও: 'কিন্তু মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই নাই। সেই চলিয়া যাইতে হবে।'

'কুথা? হারাধন গোমস্তার সঙ্গে?'

কলমির মুখটা মুহূর্তে কঠিন হ'য়ে গেল মলিন পাথরের মতো। ব'ললো, 'না।'

'তবে?'

'কি জানি!'—

তারপর দু-জনেই চুপ ক'রে রইল। সুদাম অন্যমনস্কের মতো কি যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে সে ব'ললো, 'চাষ শেষ করে

আমিও লাট যাব খাটতে। একটা গোরুর টাকা যোগাড় করতেই হবে মোকে আগের বছর।'

আবার চুপ ক'রে যায় দু-জনেই। দুজনেরই চোখে দুষ্প্রাপ্যের দুরন্ত স্বপ্ন একটা যেন ঝকমক করে।

গ্রামের চাষ শেষ ক'রে সুন্দরবনে খাটতে যাওয়ার আগে সুদাম দেখা ক'রতে এলো একদিন।

রাজেশ্বরীকে ভয়ানক চঞ্চল দেখায়।

সুদামের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো ভয়ানক বিব্রত হ'য়ে, 'আমি এখন কি করি বল তো? যাই হোক একটা ঘর-বর জুটল, যার যেমন আছে কপালে—না কি বল?'

কলমিকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে একটি লোক। বয়স বেশীই। ঘর-দোর জমি জায়গা নেই। মালিকের বাড়ীতে থাকে—নৌকোয় দাঁড়ির কাজ করে। সেই কথা বলে রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরী বললো, 'কিন্তু মেয়া মোর শুধু কাঁদে। কি আছে মোর—কি দিয়া তোকে পালি। কুথা তোকে রাখি! হারাধন গোমস্তা কবে যে এসে পড়বে ঠিক নাই!'

সুদাম এদিক ওদিক তাকায়। কলমিকে কোথাও দেখা যায় না।

রাজেশ্বরী বললো, 'আজ ক'দিন অউ রকম—একলা হয়ত বসে আছে চুপ করে কুথা।'

'দেখি।'

রাজেশ্বরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দীঘির পাড় দিয়ে এগোলো

সুদাম। চোখ গিয়ে পড়ে দীঘির ঘাটে—সেখানে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কলমি দাঁড়িয়ে আছে সুদামের যাওয়ার পথে।

সুদাম তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কবে আসবে আবার ?' কলমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

'ধান কাটার সময় লাগাত।'

আর কেউ কোনো কথা বলে না। সুদাম পথে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

তারপর মাসের পর মাস গড়িয়ে কেটে গেল অনেক দিন। ধানের গায়ে ধীরে ধীরে রং ধরলো হলুদ বরণ। ফসল কাটার দিন এলো। একে একে আবার চাষীরা এসে নামলো বৌ-হারানীর জলায়।

পদ্ম দীঘির ঘাটে এসে একদিন চমকে উঠলো কলমি—থমকে দাঁড়ালো কলসী কাঁখে। মথুরা ধান কাটতে এসেছে। ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে যেতে পারবে না ব'লে বুড়ো একটা গোরুর গাড়ী এনেছে। বট গাছের তলায় গাড়ী রেখে ধানের আঁটি বেঁধে বেঁধে গাড়ী বোঝাই করছে। গাড়ীর জোয়ালের একপাশে তার সেই গরুটি বাঁধা—আর একপাশ তেমনি খালি। হঠাৎ বুকটা তোলপাড় ক'রে উঠলো কলমির। জোয়ালের গোরুশূন্য পাশটার একটা লোককে খুঁজে এলো চোখ মেলে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কোথাও দেখা গেল না সে লোকটাকে। একা মথুরা।

শীতের গোধূলী তখন বিষণ্ণ হ'য়ে আসছে মাঠ জুড়ে, পদ্ম দীঘির ঘাটে।

মথুরার গাড়ী বোঝাই শেষ হ'লো। পরিশ্রান্ত বাঁকা কোমরটাকে সিধে ক'রে বুড়ো বিশ্রাম নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছে মথুরা গোরু-শূন্য জোয়ালের পাশটা চেপে ধরলো বুড়োটে জীর্ণ কঙ্কাল হাতে।

কলমি এগিয়ে গেল—গিয়ে দাঁড়ালো বুড়োর সামনে। মৃদু কণ্ঠে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'একলা যে? লাটের লোক কি ঘুরেনি?'

'কে?'—সুদাম? মথুরা জোয়াল ধরে দাঁড়ালো তার মুখের দিকে চেয়ে। বললো, 'কইয়া পাঠিছে—অখন আসবেনি। জমির তরে পাগল সে, লাটে অখন জমির লড়াইয়ে খ্যাপছে। পুলিস নাকি ধরছে তাকে।'

'পুলিস ধরছে?'

'হুঁ। মালিক আর পুলিস এক জোট। লাঠি, মামলা, ধর-পাকড় —কত কি চলছে। এদিকে চাষী চাষ কর আর বানে মর টানে মর, রোগে-শোকে সব ফৌত হও—কুনো কথা কইয়োনি। কইলেই বাস —লাঠি, গারদ!'

'সে কি লাটে জমি পাবে?' কলমির কথায়, চোখে অদ্ভুত আগ্রহ।

'লড়াইয়ে জিতলে পাবে—জমি পাবে ধান পাবে, দুখের কাল শেষ হবে সে দেশের লোকের।' বুড়ো মাঠের দিকে চোখ মেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো, 'এ অঞ্চলে কিছু নাই। আর পারিনি। ইচ্ছা হয় চলিয়া যাই সে-দেশে।'

বুড়ো জোয়াল চেপে ধরলো। দম বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে ঠেলা মারলো।

'লাট যাব?'

'ইচ্ছা হয়। কি আছে এখানে? ফসল-বন্ধকের সাত কাঠা জমি যেমন আছে—তেমন আছে দেনা। আর ওই একটি গরু।'

তেমনি অদ্ভুত আগ্রহে কলমি বললো, 'গেলে তাকে কইব—মোর গাইর একটা আঁড়িয়া বাছুর হৈছে। কইব?'

মথুরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো কলমির আগ্রহ ভরা মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো:

'কইব?'

অশথতলায় দাঁড়িয়ে রইলো কলমি স্তব্ধ হয়ে। একা, বুড়ো মথুরা দাস গাড়ী ঠেলে ঠেলে ধীরে ধীরে চলে গেল গ্রামের দিকে।

স্ব[illegible]বা

শীতের দিন। ফসল ওঠার কাল। গ্রামের প্রতিটি কিসানের ঘরের দাওয়া উঠোন লেপা-মোছা। ঝকঝক করছে। ধান উঠবে। লক্ষ্মী আসবে ঘরে। এমন দিনে কিষ্ট দাসের ঘরটাই শুধু মুখ গোমড়া করে আছে সারা গাঁয়ের মধ্যে। দাওয়া উঠোন বিষন্ন—মলিন। চালা ভেঙে ঝুলে পড়েছে এখানে ওখানে। সবটা শ্রীহীন। কিষ্ট দাস মারা গেছে গত বছরের ফসলে।

এ বছরের ফসলে গ্রামের লোক নেমেছে মাঠে। দূর থেকে ভেসে আসছে তাদের হাঁক-ডাক, হল্লা আর আনন্দের জয়ধ্বনি। খেজুর রসে জ্বাল দিতে দিতে কান খাড়া ক'রে শোনে কুন্দ—কিষ্ট দাসের বিধবা। একটা লোকের কথা মনে পড়ে আজ—গত বছরের কথা। মনের মধ্যে গরম খেজুর রসের মতো টগবগ ক'রে ফোটে হাজারো কথা—সেদিনের হাজারো আশা। বাইরেটা বিষন্নতায় জমাট—নিঃশব্দ। ফাঁকা ফাঁকা। এক মনে খেজুর রসে জ্বাল দিয়ে যায় কুন্দ।

চমকে ফিরে তাকায় ছেলের কথায়। বছর আষ্টেকের রোগা রোগা ছেলেটা। ছুটে এসে হাঁফাচ্ছে, নীল হয়ে গেছে কপালের শির

উত্তেজনায়। হাঁফাতে হাঁফাতে বাদল বললো, 'আজ আর গোরু চরাতে যাবনি মা।'

'কেন!' কুন্দ অবাক হয়ে বললো, 'কি হলো?'

'ধানকাটা দেখতে যাব।' বাদল সোৎসাহে বললো, 'দেখবি চল একবার—মাঠে কি হচ্ছে। সবাই একেবারে সার বেঁধে নেমে গেছে।'—বলতে বলতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বাদল থেমে যায়। আর বলার উৎসাহ বা সাহস হয় না তার।

কুন্দ রুক্ষ গলায় বললো, 'লোকের ধানকাটা দেখলে পেট ভরবে! গোরু না চরালে লোক পয়সা দেবে? খাবি কি? গাড়া ভরবে কিসে?'

বাদল চুপ।

কুন্দ বকর বকর করে চলে, 'মোদের কি! মোদের চাষ আছে না ধান আছে না জমি আছে? লোকের ধানকাটা দেখে কি হবে মোদের? চলে যা গোরু চরাতে।'

সভয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে মুখ শুকনো করে চলে গেল ছেলেটা।

জয়ধ্বনি ভেসে আসে মাঠের দিক থেকে। কয়েক মুহূর্ত কান খাড়া ক'রে শোনে কুন্দ। তারপর আবার এক মনে জ্বাল দিয়ে যায় খেজুর রসে। দূরের গোলমাল যেন একটুও স্পর্শ করে না তাকে। গুড়ের কড়াইর দিকে তাকিয়ে থাকে এক নজরে।

এই তার জীবিকা। চাষ-আবাদ নেই। সে গেছে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে। ভাগচাষীর বৌ—স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভাসছে অথৈ জলে। তারই মধ্যে খড়কুটোর মতো বাঁচার তাগিদে চেপে ধরছে সে এটা

ওটা সেটা। আর ছেলেটা গোরু চরিয়ে দু-চার পয়সা করে মাসে পায় আট আনা। এই তার সম্বল। অর্ধাসন অনশনে কোন রকমে টেনে চলা দিন।

মাঠের দিকে জয়ধ্বনিটা ফেটে পড়ে আবার অসংখ্য মানুষের তুমুল চিৎকারে। কেঁপে কেঁপে ওঠে শীতের সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া।

এমন সময় গঙ্গামনি এসে দাঁড়ালো পেছনে। আধবুড়ো মেয়েলোক একটি। বিরক্তি ভরা গলায় বললো, 'মুসলমানরা ঘুরে চলে গেল।'

'মুসলমান এসেছিল নাকি!' কুন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। 'কেন গো?'

'হ্যাঁ—এসেছিল একদল।' গঙ্গামনি তারপর চারদিকে একবার চেয়ে, গলা নামিয়ে বললো, 'বোলোনি আর কারোকে। কাল শুনেছিনু বড় পালের কাছে—মুসলমানরা এসে সব জারিজুরি ভেঙে দিয়ে যাবে লাঠির মাথায়। তা আজ সব ঘুরে চলে গেল। নেমকহারাম তো সব!—তোমাদের গেরামের ওই চরণ না কে বললো হাত জোড় ক'রে আর ঘুরে চলে গেল সব।'—

কি বললো চরণ আর ঘুরে গেল এতগুলো দাঙ্গাবাজ মুসলমান? অবাক হয় কুন্দ। বললো, 'দাঙ্গা করতে এসে ঘুরে গেল এতগুলো লোক এক কথায়!'

'হ্যাঁ গো—তবে আর নেমকহারাম বলছি কেন!' গঙ্গামনি বললো, 'চাচাভাই, মিয়াভাই বলে ওই চরণ হাতজোড় করে কাঁদতে লাগলো আর তাইতে গ'লে গিয়ে নেমকহারামরা ঘুরে চলে গেল স্যাঙাৎ পাতিয়ে। যাক। গলা চেপে ধরবে ওখানে বড় পাল। ওৎপেতে বসে আছে।'

চরণের মুখটা ভেসে ওঠে কুন্দর চোখের সামনে। বেঁটে খাটো রোগামত লোকটা। কথা কয় কম। সকলকে একজোট ক'রে, সকলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে বহুদিন থেকে ধান কেটে তোলার ফন্দি আঁটছে। কুন্দ জানে। কিন্তু তার কথায় দাঙ্গাবাজ মুসলমানরা পর্যন্ত ঘুরে চলে যাবে—এ কেমন তাজ্জব মনে হয়।

গঙ্গামনি গলা চেপে চেপে বললো, 'আরও আছে—এ হয়েছে কি! মুসলমানরা নেমকহারামী ক'রে ঘুরে গেল না হয় আজ। তারপর ফৌজ পুলিস আসবে না? রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে—দেখিস। আমি শুনেছি—বড় পাল খবর পাঠিয়েছে থানায়।'

মাঠের লোকের গলা শোনা যায় দূর থেকে—হাঁকডাক, হল্লা, জয়ধ্বনি। শুধু কানখাড়া করে শোনে কুন্দ। এই পর্যন্ত। কে ঘুরে গেল, কার সঙ্গে দাঙ্গা—এরমধ্যে তার নিজের কোনো কথা নাই। তাই আগ্রহ তার নেই বড়। আছে শুধু একটা মেয়েলী কৌতুহল। এই পর্যন্ত।

গঙ্গামনি গলায় দরদ ঢেলে বললো, 'কি ঠিক করলি বৌ? এরকম কতদিন আর চালাবি?'

'কি করবো?' বলে অসহায় চোখ তুলে তাকালো কুন্দ গঙ্গামনির দিকে। এ তার নিজের কথা। যেখানে পথ হাতড়ে মরছে সে দিনের পর দিন—আটবছরের ছেলেটাকে নিয়ে। আস্তে আস্তে বললো, 'ভগমান জানে! বল কি করি! আমি আর পারি না।'—

'তাই তো আমি বলি—চলে যা বড় পালের সঙ্গে। দিব্যি থাকবি।' গঙ্গামনি বোঝায়, 'তোর জন্যে মন যখন গলেছে একবার বড় পালের, দেখিস, রাজরাণীর মতো রাখবে। তোর ব্যাটাও মানুষ হবে।—'

তবু ভাবছে কুন্দ। যাওয়ার আগে ভাবছে পাঁচবার। স্বামী গেছে। সহায় সম্বল নেই। এখন অন্যের কাছে মান ইজ্জৎ সব সঁপে দিয়ে থাকার কথা। সুন্দরবনের নতুন আবাদে থাকে বড় পাল—ষাট বছরের বিপত্নীক বুড়ো। তার একটা মেয়ে মানুষ চাই। সেই জঙ্গল-জালপাইয়ে ভালো লাগে না একা একা। ছেলেকে গ্রামের লোক বলে ছোট পাল—সে থাকে গ্রামে। বুড়ো আসে মাঝে মাঝে—বিশেষ ক'রে জমি-জিরোত নিয়ে কোনো গোলমাল হলে। বেপরোয়া কড়া শক্ত হাতে ছেলেকে সবটা সমঝে সামলে দিয়ে চলে যায় আবার। এবারে ছোট পাল চিঠি লিখেছিল বাপকে: চাষীরা ক্ষেপে যাচ্ছে—রুখে দাঁড়াচ্ছে, সমিতি গড়ছে, জমিতে দখল দিচ্ছে জবরদস্ত। ফসলের পুরাতন ভাগ, পুরাতন রীতিনীতি বেপরোয়া উল্টে দিয়ে ফসল তুলে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের খামারে। বড় পাল সামলাতে ছুটে এসেছে সবটা। মতলব ভাঁজছে ছেলের সঙ্গে। আর গঙ্গামনিকে পাঠিয়েছে কুন্দর কাছে—সুন্দরবনে তার একটা মেয়েমানুষ চাই।

গঙ্গামনি বোঝায়, 'অত ভাবনার কি আছে? সেই ভাতুর কথা মনে আছে—গণেশ মণ্ডলের কাঠির মতো বৌটা? লাটে গিয়ে তার এখন উথলে পড়ছে কপাল। মোদের বড় পালের পাশের লাটে আছে। সাঁতরার লাটে। ছেলেপুলে হয়েছে। চাষবাস করছে।'—

যায় এই রকম মেয়েরা গ্রামদেশ থেকে সমাজ সংসার ছেড়ে, ছেলেপুলে হয় অবৈধভাবে। আসল ওয়ারিশানরা এসে তাড়া দিলে ভাসে আবার একজায়গা থেকে অন্য জায়গায়। অথবা বংশানুক্রমিক দাসত্বে বাঁধা—মায়ের জীবন থেকে ছেলের জীবন। এই রকমই চলে আসছে।

গঙ্গামনি বললো, 'চলে যা। কপাল ভালো তোর। বড় পাল খুব ভালো লোক।'

'কিন্তু ছোটপাল?' কুন্দ বললো, 'মোর ব্যাটাকে তো তাড়িয়ে দেবে একদিন?'

গঙ্গামনি গলা নামিয়ে বললো, 'না না–ছোট পাল বড় ভাল লোক। ছোট পালই তো তোর কথা বললো বড় পালকে—মেয়ে চাও তো লিয়ে যাও না কুন্দকে। কেউ কুথাও নাই–আহা!'

চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো কুন্দ। ঠিক করতে পারে না কোন কিছু। কি করবে—কোথায় যাবে। তারপর ছটপটিয়ে বলে উঠলো, 'আর কি করি বল মোকে?'

'আর!' গঙ্গামনি বললো, 'আর তোর কপাল!'

কুন্দ চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো আবার। বাঁচার আর কোনো পথ খোলা নেই। ছেলে বড় হবে সে কত দিন পরে। ততদিন চালাবে কেমন করে সে? ভেবে পায় না।

গঙ্গামনি বললো, 'আজ কিন্তু মোর জবাব চাই। বড়পাল চলে যাবে দু-এক দিনের মধ্যে। আর না যাস তো তোর কপাল। মোর স্বোয়ামী মরে যাওয়ার পর থেকে বড় পালকে দেখছি—আর ছোট পালকেও জানি। আদর করলো তো পায়ে এসে পড়বে তুমার। আর ক্ষেপে গেলে কি করে বসবে তার ঠিক নাই। মাথা গোঁজার ঠাঁই একটু রাখবে না কোথাও।'—

মুখ শুকিয়ে যায় কুন্দর। ভয়ে ভয়ে বললো, 'আজ বিকেলে একবার এসো তুমি—বলবো তখন। আর ··· আর বড় পাল জিজ্ঞেস করলে বোলো তখন'—গঙ্গামনির মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল কুন্দ।

গঙ্গামনি বললো, 'কি বলবো ?'

'যাব। যাব আমি। আমি আর পারি না।' কুন্দ ভেতরে ভেতরে তুমড়ে ভেঙে গিয়ে যেন বলে ফেললো শেষ কথাটা।

তারপর ভাবতে বসলো কুন্দ। দিকচিহ্নহীন মাঝদরিয়ায় ডিঙি ভাসানোর মতো।

দূরের মাঠ থেকে উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে আসে মাঝে মাঝে অনেকগুলি মিলিত গলার জয়ধ্বনি—ছেলেদের হল্লা। সবাই গিয়ে জুটেছে যেন এক মহোৎসবে। পরোয়া নাই কোনো। সেখানে নাই বড় পাল—ছোট পালের ভয়। গ্রামের সমস্ত কিসান ছেলেমেয়ে বৌবুড়ি—নেমে পড়েছে মাঠে জোয়ান মরদদের পেছনে পেছনে।

ঠিক কি যে ঘটে যাচ্ছে সেখানে—জানে না কুন্দ। দূর থেকে শুনেছে শুধু হল্লা আর জয়ধ্বনি, বাদল আর গঙ্গামনির মুখের কথা। চাষ-আবাদ নেই তার।—এক মনে সারা সকাল বসে বসে শুধু গুড় জাল দিয়েছে আর ভেবেছে তার কপালের কথা। গঙ্গামনি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে রইলো সে হাত গুটিয়ে। মনে মনে ভাবে, ছেলেটা একটু বড় হত যদি আজ!—উঠোন দাওয়া নিকোতো সে চিকন ক'রে গ্রামের আর সবাইয়ের মতো। ধানের গাদা বসতো গুড় জাল দেওয়ার উনুনের কাছে। ছেলে যেত ধান কাটতে মাঠে —পেছনে পেছনে সে যেত আঁটি বাঁধতে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ালো। বাদলের শুকনো মুখটা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। গোরু চরাতে চলে গেছে সে ধমক খেয়ে।

দূর থেকে ভেসে আসে খঞ্জনীতে ঘা পড়ার শব্দ। মৃদু মৃদু। যেন গান শুরু হবে কোথায়।

পায়ে পায়ে মাঠের পাশে এসে দাঁড়াল কুন্দ। কৌতূহলে।

মাঠের অনেকখানি জুড়ে ধান কাটা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সবাই উঠে এসেছে ভেড়ি বাঁধের ওপরে—তামাক খাচ্ছে আর ঘিরে বসেছে সুবল দাসকে। এক কাঁধে তার ভিক্ষের ঝোলা—এক হাতে খঞ্জনী। বর্ষার সময় থেকে গ্রামে দেখা যায় না তাকে—চাষীর ঘরে শুরু হয় তখন টানাটানির কাল। ভিক্ষে দেয় না কেউ। তখন সে ঘোরে গঞ্জের হাটে হাটে। নতুন ফসল ওঠার সময় হলেই গ্রামে এসে ঢোকে আবার। তাকে ঘিরে বসেছে সবাই। গান শুনবে। তামাক খাবে। গা গরম করবে। জিরোবে। ভোর রাত্রি থেকে এক দমে কাজ করেছে এতক্ষণ। শীতে কাঁপছে সবাই। কেউ কেউ হাত সেঁকছে খড়ের আগুনে। অথবা রোদে। সারা রাতের শিশিরে ভেজা বরফের মতো ধান গাছের আঁটি ধরে ধরে হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে সব। বেঁকে গেছে। বাঁকা আঙুলগুলো আস্তে আস্তে সিধে করে ধরে সূর্যের আলোয়। মাঠ ভাঙা উত্তুরে হাওয়া এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে হাড় পর্যন্ত।

সুবল দাস খঞ্জনীতে চাঁটি দিয়ে বললো, 'জোর করে তো ধরে আনলে। কিন্তু মাঠে ঘাটে গাইব—চাল দিবে কে?'

ভানুমতী বললো, 'দিব দিব—সাত দিন পরে দিব ঝোলা ভরে। লক্ষ্মীর পাঁচালী গা একটা—সেই বিনন্দ রাখালের পালা।' বুড়ো মানুষ। দেব-দেবীর গান শুনতে চায়। আবার ফসল ওঠার দিনে।

ফকির বলে উঠলো এক মুখ তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে, 'আর না গাইবি তো তোর ওই ঝোলা আর খঞ্জনী কেড়ে রেখে দিব।'

খঞ্জনীতে চাঁটি মারলো সুবল।

এমন সময় নতুন একজন এসে বসলো সকলের মাঝখানে। পাশের গ্রামের চৈতন। চরণের স্যাঙাৎ। দূর পথ হাঁটার ক্লান্তি তার চোখে মুখে। সবাই তাকে দেখে কলরব ক'রে ওঠে। সুবল দাস থেমে যায়।

চৈতন বললো, 'নৃতন গান শুনে এলম নন্দীগ্রামে—চাষীদের মুখে! চাষীদের সমিতির গান—লড়াইয়ের গান।'—

'গানের কথা পরে হবে,' চরণ সকলকে ঠেলে এগিয়ে এসে বসলো চৈতনের মুখোমুখি। বললো, 'লড়াইয়ের খবর বল স্যাঙাৎ। কি করছে তারা—কি করতে বললো মোদের বল।'

'সোজা হটিয়ে ভাগাও,' চৈতন বললো, 'আর বলবে কি! তাদের গেরামে জোতদার লেঠেল পাঠিয়েছিল; পুলিসও এসেছিল।—সব হটে গেছে। মেয়ে মরদ মাঠকে মাঠ সাফ করে ফেলেছে সব।'—

চরণ বললো, 'তোদের গেরামে শুরু হবে কবে?'

'গিয়ে বলি সব—তোদের খবরও বলি যাতে শুরু হয় তাড়াতাড়ি। মোদের লোকগুলো ভয় পাচ্ছে—পেছিয়ে যাচ্ছে, ভাবছে।'

ফকির বলে উঠলো, 'বলবে গিয়ে—মোদের গাঁয়ে মুসলমান লেঠেলরা এসেছিল দাঙ্গা করতে—হটে গেছে।'

'এসেছিল নাকি! জখম হয়নি তো কেউ!'

'না। দাঙ্গাই বাধলো না।' চরণ আস্তে আস্তে বললো, 'বুঝিয়ে বললাম তাদের। বললাম—তোমরাও চাষী, মোরাও চাষী—এক

কপাল নিয়ে মরি আর বাঁচি মোরা ভাই। তোমাদের সঙ্গে মোদের বিরোধ নাই। তবু মারতে চাও মার—মেরে রেখে যাও মোদের এই দুঃখে কষ্টে, আধপেটা খেয়ে মরে মরে ফলানো ফসলের ওপরে। মোদের ছেলেমেয়ে মা-বৌ সব বসলো তোমাদের সামনে। তারা কি বলাবলি করলো নিজের মধ্যে। তারপর ঘুরে চলে গেল।'

ঠেলে উঠে দাঁড়ালো চৈতন। বললো, 'মোরা কালই শুরু ক'রে দেব তবে।'

আনন্দের হর্‌রা ওঠে একটা।

এমন ক'রেই আগুন লাগছে—এক গ্রামের মাঠ থেকে আর এক গ্রামের মাঠে। প্রথম ধাক্কায় হটে যাচ্ছে জোতদারের লেঠেলরা—পুলিস-ফৌজ। হঠাৎ আচম্‌কা আঘাতে যেন বিহ্বল। দ্বিগুণ উৎসাহে গ্রামকে গ্রাম মেয়ে মরদ ঠেলে নেমে পড়ছে মাঠে—দেখাদেখি। পুরাতন লড়িয়ে সমিতির চাষীদের কাছে লোক পাঠিয়ে সব জেনে শুনে গড়ছে গ্রামে গ্রামে নতুন সমিতি। এমনি ক'রেই নেমেছে এই তল্লার মাঠের চাষী। বুক চিতানো ঠেলা জোয়ারের বেগের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে যেন সব—সরে যাচ্ছে জোতদার, লেঠেল, পুলিস-ফৌজ। জঞ্জাল।

মাঠের দিকে চেয়ে চৈতন বললো, 'রাঙা নিশান একটা পুঁতে দাও মাঠে। নন্দীগ্রামের চাষীরা মাঠময় রাঙা নিশান পুঁতে দিয়ে ধান কাটতে নেমেছে। দেখে এলম।' একটু থেমে আবার বললো, 'গ্রাম ঘিরে পাহারা বসিয়ে রেখেছে। কিছু দেখলেই শাঁখ বাজিয়ে জানানি দেবে। পুলিস এলে মরদরা গা ঢাকা দেয়—তখন মেয়েরা ধান আগলায়। ঝেঁটিয়ে তাড়ায় সব।'—

ফকির বলে উঠলো, 'সে ব্যবস্থা মোদের ঠিক আছে গো দাদা। আসুক না একবার তার জন্যে আছে মোদের বুড়ী ভানুমতী পিসী।'

গ্রামের সবাই ডাকে বুড়ীকে পিসী বলে। চৈতন হাসলো ভানুমতীর মুখের দিকে চেয়ে। বুড়ী চোখে চোখে কথা কয়—সকলের দিকে চেয়ে চেয়েঃ আশ্বাস আর নির্ভরে ভরা। চৈতন চলে গেল।

চরণ সুবলের দিকে ঘুরে বললো, 'গান গাইবি তো গা। মোরা নেমে যাব মাঠে এবার।'—

ফকির বললো, 'চৈতন কি নূতন গানের কথা বলে গেল—তাই গা একটা শুনি। মোদের চাষীদের গান।'

'আমি তো জানিনি,' সুবল বললো।

'এবার এলে শিখে আসবি। না হলে এ গেরামে ঢুকতে দেবো না।' ফকির হুমকি দিয়ে বলে উঠলো।

ভানুমতী ফকিরের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'হারামজাদার কথা শোনো—যেন এরই মধ্যে লাট হয়ে গেছে, হুকুম ঝাড়ছে। গা তুই মা লক্ষ্মীর পাঁচালী সুবল।'—ভানুমতীর গলা বুজে আসে হঠাৎ গদগদ হয়ে। হয়তো সে তার ভক্তি। হয়তো তার প্রত্যাসন্ন আনন্দ। পোড় খাওয়া, মার খাওয়া অনেকদিনের দীর্ঘ জীবনের থিতিয়ে মরা আশা—আবেগ। বুড়ী বললো, 'ভালয় ভালয় মা লক্ষ্মী এখন ঘরে উঠলে হয়।'—

'থাম বুড়ী। অত কষ্টের ধান কেটে মরছি এইখানে ফেলে রেখে যাব বলে!' ফকির বললো, 'লে—গান ধর সুবল। ভালো করে গাইবি বলে দিলাম।'

আবার হুমকি। হাসে সবাই।

সুবল গান ধরলো। বিনন্দ রাখালের কাহিনী। চাষীর ঘরের প্রিয় পাঁচালী। বিনন্দ গোরু চরায়—তাইতে চলে বড় কষ্টে মা আর ছেলের। তার দুঃখে বিগলিত হয়ে লক্ষ্মী একদিন এসে বর দিল—চাষ-আবাদ কর।...

চাষের সমান বৎস কিছু নাহি আর।
দুধে ভাতে খেতে পাবে যুগ যুগান্তর॥

ফকির ফুট কাটলো, 'হায় হায়—মোদের পেটে ভাত নাই গো দাদা!'

ভানুমতী ধমকে উঠলো।

সুবল গান গেয়ে চলেছে খঞ্জনীর তালে তালে: চাষ করবে বিনন্দ কিন্তু কোথায় তার গোরু? কোথায় বীজ ধান? কোথায় বা জমি?

সকলের পেছনে একপাশে বসে গালে হাত দিয়ে শোনে কুন্দ: এযেন তারই পোড়া কপালের কাহিনী। বিনন্দ আর বাদল এক হয়ে যায় তার মনে মনে। জমি নাই, গোরু নাই—চাষ-আবাদ নাই। সব গেছে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে। বাদল আজ ধমক খেয়ে মুখ শুকনো করে চলে গেছে গোরু চরাতে। ঠোঁট ফোলানো রোগা মুখটা তার ভাসে চোখের সামনে। সে বড় হবে—আর কপাল ফিরবে তার! ওদিকে বিনন্দের ভাগ্য উথলে পড়েছে লক্ষ্মীর বরে। লক্ষ্মীর আদেশে ধান বুনেছিল সে বনে বাদাড়ে, ভাগাড়ে, শ্মশানের ধারে। নিটোল ধানের শীষ ধরেছে তাতে—মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ফলনের ভারে। রাজা একদিন খবর পেয়ে ক্ষেপে ওঠে—এত স্পর্ধা রাখাল বালকের! রাজার ক্ষেপে ওঠা মুখ! বড় পালের বুড়োটে কঠিন মুখটা যেন কটমট ক'রে চেয়ে আছে কুন্দর দিকে।

সুবল গলা ছেড়ে গাইছে :

নৃপ শুনি রোষে জ্বলে   বিনন্দে আবার বলে
কেন কৈলি এতেক অন্যায়।
—একি দুখের কপাল গো।...
হইয়াছে যত ধান্য   আমাকে করিয়া মান্য
লয়ে আয় আমার আলয়॥
—একি দুখের কপাল গো।...

রাজার পীড়ন আর অত্যাচারের মর্মান্তিক কাহিনী দরদ ঢেলে গায় সুবল—মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে। সব সম্পদ কেড়ে নিল রাজা। বিনন্দ—আবার সেই রাখাল বিনন্দ। কুন্দর চোখের সামনে ভাসে—ছেলেটা তার কোন ভাগাড়ের ধারে এখন গোরু চরাচ্ছে মুখ শুকনো করে। বিকেলে আসবে গঙ্গামনি। উপায় নাই, এই গ্রাম ছেড়ে, অনেক সুখ-দুঃখের স্বামীর ভিটে ছেড়ে চলে যাবে সে কোথায়! এখানে গ্রামে ফসল উঠবে, সুখে থাকবে সবাই। স্বামীপুত্র বাপ-ভাইয়ের সংসারে সকলের কেটে যাবে দিন—জীবন। তার নেই। তার শুধু কেউ নেই।—একটা বোবা আবেগ ঠেলে ওঠে তার বুকের ভেতরে।

ওদিকে হো হো করে হাসিতে খুশিতে ফেটে পড়েছে সবাই। লক্ষ্মী শেষ কালে বর দিল হতভাগ্য বিনন্দকে :

লইল তোমার ধান্য যেই নরপতি।
তার কন্যা হবে তব ভার্যা গুণবতী॥

গান শেষ হলো হর্‌রার মাঝখানে। একজন শুধু ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছে।

সুবল দাসের কানে গেছে ফোঁপানীর শব্দ। সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো, 'কাঁদলো কে গো?'—

সবাই ঘুরে তাকালো পেছনে। কেঁদে ফেলেছে কিষ্ট দাসের বিধবা—কুন্দ। চোখ মুছছে মুখ ঘুরিয়ে।

ভানুমতী চোখে ভালো দেখতে পায় না। চোখ কুঁচকে এগিয়ে গেল কুন্দর দিকে। সামনে গিয়ে বলে উঠলো, 'ওমা—কুন্দ! এ যে মোদের আর এক রাখাল বিনন্দের মা গো! কাঁদ কেন গো! তুমাকে তো দেখিনি সকাল থেকে! আসনি কেন?'

কুন্দ নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'মোর তো জমি নাই—চাষ নাই পিসী।'

'তোর ব্যাটা কি চিরকাল রাখালী-বাগালী করবে—চাষ করবেনি?' ভানুমতী মাঠের দিকে চেয়ে বললো আস্তে আস্তে, 'এই জলায় খেটে খেটে অকালে মরে গেল কিষ্ট দাস মোর তিন তিনটা জোয়ান ব্যাটার মতো। আজ তোর চাষবাস নাই, জমি নাই। শুধু ভগমান জানে—কি হবে! তবে তল্লার মাঠের চাষীরা জিতলে সব আবার হবে একদিন তোর ব্যাটার।'

যেন বুঝতে পারছে না কথাটা কুন্দ। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো ভানুমতীর দিকে। এতগুলো লোকের সঙ্গে তার পোড়া কপালটাকে জড়াতে পারলে আজ সে বেঁচে যায়। তা কি সম্ভব! বিশ্বাস হয় না যেন তার। ভয় হয়। এমনি ভাবে বললো, 'আমি কাজে লাগব?' বলে তাকালো সে চরণের দিকে। এ সমস্ত ব্যাপারের মাঝখানে আছে ওই লোকটা। ভালো করেই জানে কুন্দ। সে হয়তো বলে বসবে এখুনি—'না।' চাষ বাস, জমি নাই তার। ভয়ে ভয়ে আর সাগ্রহে তাকালো সে চরণের মুখের দিকে।

চরণ বললো, 'নেমে পড় মাঠে—হাত লাগা কুন্দ—আঁটি বাঁধ। লেগে যা কাজে।'

চরণের কথাগুলো যেন ছিড় হিড় করে টান মারে মাঠে। মাঠে নেমে পড়েছে অন্য সবাই।

কুন্দ মাঠে নামলো। ভানুমতী দাঁড় করিয়ে দিল তাকে চরণের পেছনে। বললো, 'মোরা বাঁচবো আর গেরামের বিধবা বৌ একটা কি ভেসে যাবে?'

ফকির হাঁক পেড়ে বললো, 'সবাই শুনে রাখ হে—তল্লার মাঠের চাষী বাড়লো একজন—কিষ্ট দাসের ব্যাটা। তার জমি এ-সন চাষ করেছি মোরা সবাই।'

তারপর একটানা ধান কাটার ঘস্ ঘস্ শব্দ, আর পরিপূর্ণ ধানের শীষের নিটোল নিক্কণ। ধানে ভরা বিরাট মাঠটার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত তখনও ঢেকে আছে কুয়াশায়। মাঝে মাঝে এক একটা উত্তুরে হাওয়ার হল্‌কা দিগন্তের একপ্রান্ত থেকে ধানবনের ওপর দিয়ে ছুটে আসে সর্ সর্ করে। সকালের সূর্যের আলো যেন শিশিরে ভেজা—মরা মরা—ঠাণ্ডা। ধানগাছগুলো শিশিরে ভিজে বরফ হয়ে আছে এখনও। জোড়া জোড়া কঠিন হাতের কর্কশ আঙুল গুলো ভিজে ভিজে ঠাণ্ডায় বেঁকে শক্ত হয়ে যায় আবার। পুরুষরা ধান কাটে। পেছনে পেছনে মেয়েরা আঁটি বেঁধে যায়। ছোট ছেলেমেয়ে গুলো হল্লা করে সারা মাঠে।

চরণের হাত চলে সবার চেয়ে খর। এরই মধ্যে সারির সকলকে ছাড়িয়ে একটা সরু ফালি করে ঢুকে পড়েছে ধানবনের মধ্যে। পেছনে কুন্দ। প্রাণপনে আঁটি বাঁধছে সে। এ যেন তার পরীক্ষা। গ্রামের

সব চেয়ে সেরা খাটিয়ে লোকটার পেছনে তাকে ভানুমতী দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে যেন পরীক্ষা করবার জন্য। চরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে সে, আর বার বারই মনে পড়ে ছেলের শুকনো মুখটা : কোথায় সে এখন গোরু চরাচ্ছে, একা।

'তখন অমন করে দাঁড়িয়ে ছিলি যে!' চরণ বললো মৃদু কণ্ঠে।

কথায় তার দরদ আর উষ্ণতা। নির্ভর আর আশ্বাসে ভরা। পুরুষের এই গলে গলে পড়া গলা জীবনে যেন কোনোদিন শোনেনি কুন্দ। অথবা শুনেছিল কোনদিন—ভুলে গেছে, আজ শুনলো আবার নতুন করে। হাত কেঁপে ওঠে হঠাৎ। ধানের গোছা ধরেছিল হাতে—সেগুলো পড়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে তাকালো একবার চরণের দিকে। চরণের কাস্তে চলেছে সমানে একভাবে। দেখলো না। বুকের মধ্যে হাঁফধরা আবেগ একটা ছটফট করতে থাকে। চোখে জল এসে পড়ে আবার। কোনো রকমে সামলে নিয়ে চোখ মুছলো। তবু এত করেও ফোঁপানী একটা চাপতে পারে না কুন্দ।

'তুই কাঁদছিস কুন্দ!' চরণ বললো, 'কেন বল দেখি?'

কেন সে জানে না। দুঃখে নয়! কি যে আছে আজ অনেক দিনের চেনা, অনেক দুঃখের এই মাঠে—সে জানে না। শুধু তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে লুটোপুটি করে এই মাঠের মাটিতে। নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে দ্রুত হাতে ধানের আঁটি বাঁধে সে। নাকে এসে লাগে চরণের গা থেকে কড়া তামাকের গন্ধ। কানে শোনে তার কর্মঠ হাতের কাস্তে চালানোর শব্দ—দ্রুত, বলিষ্ঠ। প্রতিটি সবল নিশ্বাস। হঠাৎ কতদিন পরে যে মনে পড়ে যায়—একেবারে হঠাৎ: এই লোকটার সঙ্গে কবে একদিন যেন তার বিয়ের কথা হয়েছিল।

তার বাপের বাড়ীর গ্রামে—হাটের পথে যেতে দেখছিল সে শুধু এক-দিন এই লোকটিকে। তার দিদিমা চিনিয়ে দিয়েছিল। তারপর জীবন বদলে গেছে বহুভাবে।

'সরো গো—মোকে বাঁধতে দাও।' কুন্দর পেছনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল কে।

চমকে ফিরে তাকালো কুন্দ। সারদা। চরণের বৌ।

কুন্দ অসহায় ভাবে তাকালো চরণের দিকে।

চরণ বললো, 'আমার সঙ্গে একা পাল্লা দিতে পারবিনি সারদা—দু-জনে আঁটি বাঁধ।'

হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে সারদা। রুখে দাঁড়ালো। বললো, 'বটে'! ও একা পারে—আমি পারবনি! ও তোমার পিছনে কেন? বল?' ক্ষেপে যাওয়া চোখে সারদার সংশয় যেন ঝক্‌মক্ করে কাস্তের ধারের মতো।

ভানুমতী এগিয়ে এলো। সারদার দিকে চেয়ে বললো, 'ঝগড়া করো কি গো? কাজ কর—কাজ কর! একি ঝগড়ার সময়!'

'ও কেন এখানে? ওর জমি না—চাষ না কি!'

'তবে কি ওর মা ব্যাটা ভেসে যাবে? কুন্দ, আয় মোর সঙ্গে।' ভানুমতী টেনে নিয়ে গেল কুন্দকে তার নিজের যায়গায়।

হ্যাঁ, তার ব্যাটা—শুধু তার বাদল—তার বিনন্দ! তার নিজের জীবন তো এ জন্মের মত শেষ—বাকী শুধু তার ছেলের জীবনটা। —মনে মনে বলে কুন্দ—মনে মনে হাতড়ায় যেন: একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই—একটু জমি—তার ছেলের জীবন। আর কিছু না। ভানুমতীর পাশে দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে ধানের আঁটি বেঁধে যায় কুন্দ।

একবারও আর মুখ তোলে না। কিছুক্ষণ আগের ভেজা ভেজা মুখ চোখ হঠাৎ শুকিয়ে যেন কঠিন পাথর হয়ে গেছে।

মনে পড়ে যায়—বিকেলে গঙ্গামনিকে আসতে বলেছিল। —বড়পাল।—তার কঠিন সেই বুড়োটে মুখটা। আর কোথায় সেই সুন্দরবন! ··· একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই শুধু—একটু জমি—তার ছেলের জীবন। আর কিছু নয়।

সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে ঢলে পড়ে পশ্চিম দিকে—তখন মাঠ থেকে উঠে আসে সবাই। ব্যাঁকা কোমরগুলোকে সিধে করে মেয়ে মরদ বুড়ো ভেড়িবাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পাহারা বসিয়ে খেতে যায়। ঘরে আধ-পেটা খেয়ে এসে আবার নামে মাঠে। কিসান বৌর ছেঁড়া লাল সাড়ী একটা বাঁশের আগায় বেঁধে পুঁতে দেয় সেটা মাঠের মাঝখানে। চৈতন বলে গেছে। তার চার পাশে মেয়ে মরদ ঝুঁকে থাকে একভাবে। শীত-অপরাহ্নের সূর্য বিষণ্ণ হয়ে ওঠার আগে মাঠের ধান ওরা প্রায় কেটে শেষ করে আনে। সারা দিনের বাঁধা ধানের আঁটিগুলো শিশির শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে উঠেছে।

চরণ হাঁক দিয়ে বললো, 'বোঝা সাজাও এবার কিছু লোক।'

এবার ফসল উঠবে ঘরে। বহু সংশয় বহু প্রতীক্ষার পরে।

দু'দলে ভাগ হয়ে যায় সবাই। একদল বোঝা সাজায়—আর একদল ধান কাটে, আঁটি বাঁধে। হঠাৎ হল্লা ক'রে ওঠে ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো। দল বেঁধে ছোটে বোঝা সাজাতে।

এ বেলায় বাদল এসেছে মাঠে। আঁটি বাঁধছে তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। বললো, 'বোঝা সাজাতে যাই মা।'

'যা।'—

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে কুন্দ তার ছেলের দিকে। হাতের কাজ থেমে যায়। কয়েকটা মুহূর্তের বিভ্রান্তি। যেন স্বপ্ন ভেসে যায় চোখের ওপর দিয়ে। কোনো এক ভাবীকাল।—কোনো এক মাঠে। ধান কাটছে বাদল।—পেছনে সে আঁটি বাঁধছে। ঠিক আজকের মতো। ···

তারপর সামনে যেন ভুত দেখলো কুন্দ। চমকে ওঠে। সামনে এসে দাঁড়ালো গঙ্গামনি ভেড়িবাঁধের ওপরে। ডাকলো।

কুন্দ মুখ শুকনো ক'রে এগিয়ে গেল।

গঙ্গামনি চাপা গলায় বললো, 'ঘরে যেয়ে পেলমনি!—তা বল তুমার খবর। কখন যাবে?'

'আমি যাবনি গঙ্গামনি,' আস্তে আস্তে একটি একটি করে বললো কুন্দ।

'সে কি গো! বড় পালকে যে বলতে বললে মোকে'—গঙ্গামনি অবাক চোখে তাকালো কুন্দর দিকে।

'মা!'···

মাঠ থেকে ডাকছে বাদল। ছোট বোঝা একটা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি চলে যাও গঙ্গামনি।' কুন্দ যেন ছুটে পালালো।

গঙ্গামনি হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো মাঠের দিকে। ধান কাটা শেষ করে বোঝা বাঁধছে সবাই—দ্রুত, খর। ছেলেমেয়ের চেঁচামেচি হল্লা। সকালের মাথা হেলানো ধানবন ফাঁকা হয়ে গেছে বিকেলে। তুলে কথা কইছে না কেউ। বোঝা সাজিয়ে চলেছে জোড়া জোড়

থর হাত। দেখতে দেখতে এখানে ওখানে উঁচু হয়ে উঠছে ধানের আঁটির স্তূপ এক-একটা। কুন্দ মিশে গেল তাদের মাঝখানে।

বিরাট এক বোঝা সাজিয়ে ফকির হাঁক পাড়লো ভানুমতীকে, 'তুমি একটু ছুঁয়ে দাও গো পিসী—পয়লা বোঝাটা ছুঁয়ে দাও তুমার পয়মন্ত হাতে।'

ভানুমতী হাসলো কি রাগ করলো—বোঝা গেল না। বললো, 'অতবড় বোঝা—পারবি?' বুড়ী এগিয়ে এলো।

ফকির বললো, 'পারবো পারবো—তুমার মাঠ শুদ্ধ মাথায় করে লিয়ে যাব আজ: লক্ষ্মীর বর আছে মোর—রাজার কন্যা হবে মোর ভার্যা গুণবতী।' পাঁচালী গেয়ে উঠলো ফকির।

'আর চপলা? কথাটথা সব ঠিক করে এখন তাকে ঘরে তুলবে কে রে মুখপোড়া।' ভানুমতী বললো হাসতে হাসতে।

গ্রামেরই মেয়ে চপলা। জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে বুড়ো বাপের পেছনে।

মেয়ে মরদের হঠাৎ ফেটে পড়া হাসি চমকে দেয় যেন সারা মাঠ-টাকে। বুড়োরা বুড়ীরা চেয়ে থাকে স্নিগ্ধ চোখে: বলিকুঞ্চিত প্রতিটি রেখায় সারা জীবনের ক্লান্তি আর শ্রমের গভীর ইতিহাস। কোটরে ঢোকা নিষ্প্রভ চোখে প্রাণপণে চেয়ে চেয়ে দেখে যেন তারা—ফকির নয়, চপলা নয়—অর্ধস্ফুট অনাগত কোনো জীবনের ঘটনা—মমতায়, সস্নেহে। সূর্য অস্ত গেছে। ঠাণ্ডা মৃদু আলোয় চপলার রোমাঞ্চিত সংকোচের মতো হামাগুড়ি দেয় অন্য কোনো জীবন—কোনো আধ-ফোটা সম্ভাবনা। প্রাণভরে চেয়ে আছে কুন্দ।

চমকে দেয় বাদল। বললো, 'মোকে বোঝাটা তুলে দাও মা।'

ভানুমতী বললো, 'ও পারবেনি কুন্দ—ফেলে দেবে।'

বাদল মুখ শুকনো ক'বে তাকাল কুন্দর দিকে। সকালের সেই শুকনো মুখটার মতো। ধমক খাওয়া।

'দি পিসী ওকে একটা। নিয়ে যাক।' কুন্দর কথাগুলো শোনায় কাকুতির মতো।

তার আজকের দিনের ভাগ—তার সন্তানের ভাবীকালের অংশ—তার আগ্রহ। তার আশা। সবটাকে সে আজ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে দিতে চায় সকলের সঙ্গে।

বাদলের মাথায় বোঝা তুলে দিয়ে অনেক্ষণ চেয়ে রইলো সে। হঠাৎ অন্যমনা হয়ে যায়। বোঝার আঁটিগুলো সাজিয়ে যায় যন্ত্রের মতো। সূর্যাস্তের আধো আলো আধো অন্ধকারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাথা গোঁজার মতো একটু ঠাঁই—একটু জমি।...বেশী কিছু না। আজকের মতোই বোঝা তুলে দিল সে ছেলের মাথায়—ছোট বোঝা না, অনেক বড়। ধান উঠলো কোনো একটা মাঠ থেকে। শাঁখ বাজালো সেঃ লক্ষ্মী ঘরে উঠলো। লেপা মোছা প্রাঙ্গণের এক কোণে খড়ের গাদা। তারপর কে যে পাশ ঘেঁষে বসলো আর কি যে বললো ... সে যে কবেকার কথা!—তার অতীত আর ভাবীকাল মিশে একাকার হয়ে যায়।

কুন্দ চেয়ে আছে কোথায় জানে না। স্বপ্নসম্ভাবনার কোনো একদিনে—গর্ভিনী নারীর মতো। সেখানে নতুন কলরব—একটু শান্তি। আজকের দিন পার হয়ে, তার চব্বিশ বছরের গোটা ক্ষুধার্ত জীবনটা যেন চেয়ে আছে কোনো এক নতুনতর দিনে।

এমন সময় বহুদূর থেকে শাঁখের শব্দ শোনা যায়—বিপদের সঙ্কেত। প্রথমে একটি—তারপর অনেকগুলি। মাঠের লোকগুলি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। অন্ধকারে মুখগুলো সব কঠিন হয়ে ওঠে পাথরের মতো।

ভানুমতী ডাক দিয়ে বললো, 'পুরুষরা সব চলে যাও গো।'—

চরণ বললো, 'আমি থাকবো।'

'মাথা খারাপ কোরোনি।' ভানুমতী তাকে বুঝিয়ে বলে, 'জান—তোমাদের দেখলেই ধরে লিয়ে যাবে। পুরুষমানুষের কত কাজ!—মাঠের ধান মাঠেই পড়ে আছে এখনও।'

চরণ চুপ করে কিছুক্ষণ কি ভাবলো। তার পর বললো, 'মোদের অতো কষ্টের ধান লণ্ডভণ্ড করে দিবে পিসী।'

'মোরা তো রইলাম।' ভানুমতী বললো বলিষ্ঠ আশ্বাসে।

শাঁখের সঙ্কেত থেমে গেছে। সারা মাঠ যেন থম থম করছে দুর্জ্ঞেয় এক অমঙ্গলের আশঙ্কায়। কারুর মুখে কথা নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো আতঙ্কে মায়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

ভানুমতী পুরুষদের তাড়া দিয়ে বললো, 'দেরি কোরোনি তোমরা। চলে যাও। যা চরণ।'—

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চরণ যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো। তার মুখের দিকে চেয়ে কুন্দ বললো, 'তুমি আমার বাদলকে সঙ্গে রাখ।'

পুরুষের দল চলে গেল—সঙ্গে কচি কচি ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সকলের শেষে চরণ। বাদলের হাত ধরে মাঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখ নীচু করে।

মেয়েরা চেপে বসলো ধানের আঁটির ওপরে—অপেক্ষা করতে লাগলো।

ভানুমতী বললো, 'যা হয় হবে। কেউ চেঁচিওনি। চেঁচালে পুরুষরা ঠিক থাকতে পারবেনি—ছুটে আসবে। আর ধরা পড়বে সব তা হলে। বুঝলে?'

সবাই চুপ করে শোনে কান পেতে।

তারপর কুয়াশা আর অন্ধকারের আড়ালে এক পাল বুনো মহিষ যেন মাঠে এসে নামলো। তাদের তাণ্ডবের সামনে মেয়েরা কিছুক্ষণ বসে রইলো স্তব্ধ হয়ে। অনেকগুলি টর্চের সুতীব্র প্রলুব্ধ দৃষ্টি যেন মেয়েদের মুখে বুকে সর্বাঙ্গে বার বার চোখ বুলিয়ে গেল। তারপর এক সঙ্গে কয়েকটা টর্চ স্থির হয়ে রইলো ফ্যাকাশে চপলার ওপরে। বিদ্যুৎবেগে তাকে আড়াল করে এসে দাঁড়ালো ভানুমতী। টোল খাওয়া বুড়ো মুখটা তার অদ্ভুত কঠিন দেখায় আলো-অন্ধকারে।

মত্তকণ্ঠের গর্জন ফেটে পড়লো এবার, 'তোদের পুরুষগুলো কোথায়?'

'জানিনি।'

'জানিসনি?'

টর্চের আলো নিভে গেল। সেখানে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

আর এক পাশে একটি ষণ্ডা মতো লোক দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো। কেরোসিন ঢাললো। মলিন আলোয় হলদে ধানের শীষগুলি যেন হেসে ওঠে।

কুন্দ বসে আছে চেপে। তার চোখের তারায় ছোট একটা

আগুনের শিখা নেচে নেচে উঠলো। বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো কুন্দ। মুহূর্তের মধ্যে ষণ্ডা লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে তার দেশলাইটা কেড়ে নিয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে ছুঁড়ে দিল প্রাণপণে।

'তবে রে শালী!'—

শুধু প্রাণপণে একটা আর্তনাদ চাপতে চাপতে উলটে পড়লো কুন্দ। না—চেঁচাবে না। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণার আবেগকে চাপতে লাগলো তার শেষ শক্তি দিয়ে আর ছটপট করতে লাগলো মাটির ওপরে।

আবার একটা হিংস্র পায়ের লাথি পড়লো সিধে পেটের ওপর।

চপলাকে তখন কোল-পাঁজা করে নিয়ে যাচ্ছে উন্মত্ত দলটা। তাদের ঘিরে ঘিরে চলেছে মাঠের সব কটি মেয়ে—সবার আগে ভানুমতী।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মাঠে যেন একটা খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেল—দাপাদাপি, ক্ষীণ আর্তনাদ আর গোঙানিতে। তারপর সব আবার স্তব্ধতায় থম থম করে।

অনেকক্ষণ পরে অত্যন্ত সন্তর্পণে মাঠে এসে দাঁড়ালো চরণ—তখন এক প্রহর রাতের ম্লান এক ফালি চাঁদ উঠে এসেছে দিগন্তের বনসীমার মাথায়। মাঠ শূন্য। ধানের গোছানো আঁটিগুলো পড়ে আছে এলোমেলো হয়ে। তারই একপাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কুন্দ। ধীরে ধীরে সে তার পাশে এসে দাঁড়ালো—ডাকলো:

'কুন্দ!'

কোনো সাড়া নেই। পায়ে কি যেন ভেজা ভেজা লাগে চরণের। ঠাণ্ডা। ঝুঁকে দেখলো সে ম্লান চাঁদের আলোয়: রক্ত জমে গেছে। কুন্দকে ধরে চিৎ করে শুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো সে - পারলো

না। জমাট ঠাণ্ডা শরীরটা এরই মধ্যে শক্ত হয়ে উঠেছে। কঠিন দুটো মুঠো খিল ধরে গেছে ধানের আঁটির সঙ্গে। সে মুঠো ছাড়ানো যায় না কোনো রকমে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো চরণ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কয়েক মুহূর্ত। আদিগন্ত মাঠটাকে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে হঠাৎ। ভয়াবহ। কুয়াশায় ঘনঘোর হয়ে উঠেছে সবটা। আকাশের তলার সমস্ত পরিব্যাপ্ত শূন্যতাটা ভরে গেছে সেই কুয়াশার ধোঁয়ায়। মুহূর্তগুলো নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে তার মাঝখানে। নিস্তরঙ্গ। ঠাণ্ডা। মরা মরা।

নিঃশব্দে উষ্ণ জীয়ন্ত মানুষগুলি একে একে আবার এসে নামলো মাঠে।—ক্ষুধার্ত। দাঁত চাপা।

[illegible]

শ্রীহর্ষের জীবনে একটি সকাল এলো। একটি স্মরণীয় সকাল। বিগত বিশ বছর ধরে অবিশ্যি অনেক সকালই এসেছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল যেন কোনো সুইচ-টেপা যন্ত্রবিশেষের। ভোর হ'য়েছে দিনের পর দিন—আর শ্রীহর্ষ তার অসংখ্য কাজের মধ্যে বিরামহীন—বিশ্রামহীন চাকার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছে বিশ বছর ধরে। দীর্ঘ কয়েক বছরের একটানা এই যান্ত্রিক ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের জঠরে গড়ে উঠেছে বিরাট কারখানা। ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে নানা দিকে। বিত্ত এসেছে প্রচুর। কিন্তু চিত্ত ছিল না—একটি সচেতন উপভোগী চিত্ত। ত্রিশ বছরে পৌছবার আগেই স্ত্রী গেল মারা—দারিদ্র্যপীড়িত, ঔষধবিহীন—পথ্যহীন। সৌভাগ্যের বিষয়—সেই অবস্থায় স্বর্গত স্ত্রীলোকটি কোনো শিশুসন্তান রেখে যায়নি। অতএব মাথা উঁচু ক'রে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে শ্রীহর্ষের কোনো পরোয়া ছিল না সেদিন। সেদিন থেকে শ্রীহর্ষ পেরিয়ে চলে এসেছে তার পঞ্চাশ বছর বয়সের পরপারে।

তারপর আজ একটি সকাল এলো—একটি ক্ষান্তবর্ষণ সকাল। শ্রীহর্ষ চোখ মেলে তাকালো তার পিছনের ফেলে আসা জীবনের

দিকে নয়, নয় তার সুমুখের কয়েকটা বাকী বছরের দিকে। মানুষের অনুভূতিপ্রবণ যে চোখ একটা আছে—সেই চোখ দিয়ে শ্রীহর্ষ তাকালো একটা অখণ্ড জীবনের দিকে।

কলকাতার ক্লান্ত আকাশ মেঘে ভ'রে আছে ক'দিন। শেষ রাত্রির দিক থেকে বর্ষা শুরু হয়েছে। বর্ষাভেজা ভোরের আলোয় অপরিচ্ছন্ন বিষণ্ণ নাগরিক দিন চেয়ে আছে ঘোলাটে চোখে।

চোখের উপর থেকে খবরের কাগজখানি নামিয়ে হাই তুললো শ্রীহর্ষ। অসুস্থ সে—এবং ভয়ানক ক্লান্ত। বিগত বিশ বছরের মধ্যে কখনো এ রকমটা হয়নি তার। এই মাত্র সপ্তাহ তিন আগে দিব্যি কর্মঠ দেহ আর মন নিয়ে একটু বাইরে গিয়েছিল সে ব্যবসার নানা প্রয়োজনে।. এখানে-ওখানে কদিন খুব ঘুরেছে। হঠাৎ বোম্বেতে গিয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। ডাক্তার ব'ললো বিশ্রাম নিতে। অসুখ —ব্লাড প্রেসার। গত দুটো সপ্তাহ ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে ছিল। সপ্তাহ দুই বাইরে কাটিয়ে ক'লকাতায় ফিরেছে সে মাত্র কাল রাত্রিতে। আজ ভোরের ক'লকাতার দিকে তাকিয়ে ভালো লাগছে না তার। কেমন একটা অপরিচিত বিতৃষ্ণা অনুভব ক'রছে সে। পাড়ার কোনো বাড়ীতে বোধ করি বিয়ে—শানাই বাজছে। বর্ষণক্লান্ত বিষণ্ণ ভোরের মতো একটা অস্পষ্ট সকরুণ সুর নিঃশব্দে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার চেতনাকে। কিছুই ভালো লাগছে না শ্রীহর্ষের—শুধু মনে হচ্ছে তার, সে ভয়ানক ক্লান্ত।

শ্রীহর্ষ খবরের কাগজখানি চোখের সুমুখে আবার তুলে ধরলো। মনে হ'লো, এখন আর তার কিছুই ক'রবার নেই। না, কিছুই ক'রবার নেই—কিন্তু কিছু একটা সে ক'রতে চায়। কোথাও একটু

নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারলে যেন বাঁচে। তবু এত ক্লান্ত সে—আর কোথায় যেন কতকগুলো ছেলে-মেয়ে ভয়ানক চেঁচামেচি ক'রছে।

বিরক্ত হ'য়ে শ্রীহর্ষ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। তারই আশ্রিত কয়েকটি ছেলে মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ছুটোছুটি ক'রছে। অকারণ আনন্দ উচ্ছ্বাস হল্লা। অসহ্য মনে হলো শ্রীহর্ষের। ধমকে উঠলোঃ 'এই!'—

একটি ছোট ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে থমকে দাঁড়ালো শ্রীহর্ষের সুমুখে—আরগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো।

'লেখা-পড়া নেই!' বিরক্তিতে ফেটে পড়লো শ্রীহর্ষ।

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললো, 'আজ ছুটি'—

'ছুটি!' নিজের ওপরেই যেন মহাবিরক্তি হ'য়ে উঠলো শ্রীহর্ষ—ধমকে ব'ললে, 'তাতে হয়েছে কি!'

ধমকানি খেয়ে চলে গেল ছেলেটি। শ্রীহর্ষ ফিরে এলো ঘরে। খবর কাগজখানি তুলে নিল আবার চোখের ওপরে। তারপর তক্ষুনি নামিয়ে রেখে দিলে। চোখ পড়লো টেবলের উপরে। ক্যালেণ্ডার ষ্ট্যাণ্ডে মোটা মোটা অক্ষরে একুশ তারিখটা লাল টকটক্ ক'রছে। আজকের দিনটা ছুটি না থাকলেই যেন ভালো হ'তো শ্রীহর্ষের পক্ষে। বিশ্রী! আজ তার কিছু ক'রবার নেই। ইজিচেয়ারে চুপ ক'রে শুয়ে রইলো শ্রীহর্ষ। বাইরের ক্ষান্ত বর্ষণ অপরিচ্ছন্ন সকালের মতো একটা ঠাণ্ডা বিষণ্ণতা তার মনের মধ্যে ঘনঘোর হ'য়ে এলো। শানাইটা সেই যে কখন থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে বাজছে কোথায়! অবসরশান্ত ছুটির একটি দিন বাইরের জগৎ থেকে নিঃশব্দে শ্রীহর্ষের মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রল। সুমুখে খবর কাগজটা পড়ে রইলো।

বিরাট জগৎ—অনেক কাজ—অনেক লোক—আর অত্যন্ত পরিচিত ক'লকাতা থেকে শ্রীহর্ষ যেন অনেক দূরে কোথাও সরে গিয়েছে। ডাক্তারের উপদেশ, আজ সকালের ধমক-খাওয়া কচি ছেলেটির কণ্ঠস্বর, বর্ষণকাতর ক'লকাতার আকাশ—সবগুলো মিলে যেন কোনো রিফ্রিজেরেটর থেকে নিঃশব্দে ঠাণ্ডা গলায় কানের কাছে, ক্লান্ত দেহে—মনের গভীরে ব'লছে : ছুটি—অবসর।

শ্রীহর্ষ সিগারেট ধরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বিরাট বাড়ীটার একপাশ ঘেঁষে গ্যারেজ। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়লো শ্রীহর্ষের। গ্যারেজের পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো তখনও জলে ভিজে ভিজে খেলছে। ওদের মধ্যে একটি বড়ো সড়ো মেয়ে—বছর চোদ্দ বয়স হবে বোধ করি, শাড়ীর আঁচলে তার চোখ বাঁধা। তাকে ঘিরে এক গাদা ছেলে-মেয়ের হল্লা। শ্রীহর্ষ তাকিয়ে রইলো সেই দিকে। আশ্চর্য, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে! সিগারেট শেষ হ'য়ে গেল। শ্রীহর্ষ তাকিয়ে রইলো : বড়ো মেয়েটি কারুকেই ধরতে পারছে না। ঘুরে ঘুরে পাকা বিলেতী বেগুনের মতো টুক্‌টুক্ ক'রছে মেয়েটির মুখ। টমি কুকুরটাও লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে—মাঝে মাঝে এসে বড় মেয়েটির শাড়ী কামড়ে ধরছে। শ্রীহর্ষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। মোটর মোছা ছেড়ে অবিনাশও তাকিয়ে আছে ওদের খেলার দিকে।

পায়ে শাড়ী জড়িয়ে হঠাৎ ধুপ ক'রে প'ড়ে গেল সেই মেয়েটি। টমি ছুটে এসে তার লম্বা বেণীটা কামড়ে ধ'রে টানতে লাগলো।

মেয়েটি খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে ব'ললে, 'এই।—উঃ, লাগছে তিমির। ধরেছি,—ওঠ্—ওমা!'

টমিকে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটি—টমি কামড়ে দিয়েছে হাতে। সকলে হাত-তালি দিয়ে হেসে উঠলো, অবিনাশও হাসলো। আর আশ্চর্য, শ্রীহর্ষও হেসে উঠলো।

এমন সময়ে হঠাৎ চোখ পড়লো অবিনাশের: শ্রীহর্ষ তাকিয়ে আছে। অবিনাশ ঝুঁকে ঝুঁকে মোটর মুছতে লাগলো জোরে হাত চালিয়ে। ছেলেমেয়েগুলো ছুটে পালালো।

ভয়ানক বিরক্ত হ'লো শ্রীহর্ষ, ফিরে এলো আবার তার বসবার ঘরে। ইজি-চেয়ারে এলিয়ে দিল নিজেকে।

মেঘস্নাত সকালের আলো ভেঙে ভেঙে সানাইয়ের অস্পষ্ট সুরটি তখনও ভেসে ভেসে আসছে। ক্লান্ত দেহ মনের নিষ্পলক এক জোড়া চোখ মেলে শ্রীহর্ষ মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো—অনেকক্ষণ। আশ্চর্য! কতদিন যেন দেখেনি! পৃথিবীকে—আকাশকে সে যেন আজ এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। ভালো লাগছে তার—ভালো লাগছে না তার। ক'লকাতার বাইরে অবসরশান্ত কোন একটা দেশ তার অসুস্থ দেহের মস্ত বড় একটা আলস্যলোভী মনকে যেন আজ আস্তে আস্তে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ জয়ার নাম মনে পড়লো তার। ইচ্ছে হ'লো, নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয়। বড়ো ক্লান্ত সে।

এমন সময়ে সোফার এসে জানালো, গাড়ী তৈরী।

লেকের দিকে বাড়ী উঠছে। প্ল্যানের সামান্য একটু অদলবদল হবে। তার নিজের যাওয়া প্রয়োজন; যাওয়ার কথাও ছিল। সোফারের দিকে তাকিয়ে শ্রীহর্ষ কিন্তু মনে মনে ব'ললো, না—সে যাবে না।

কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হ'য়ে উঠলো : আজ বিশ বছরের মধ্যে যা হয়নি—তা' কেমন ক'রে হবে ! ক্লান্ত সে সত্যি, কিন্তু এই সকাল নটায় শোয়ার ঘরে ঢোকা তার পক্ষে একটা ভীষণ শক্ত কাজ ব'লে মনে হ'লো। সোফারের ওপরেই বিরক্ত হ'য়ে উঠলো শ্রীহর্ষ। তারপর বিশ বছরের কর্মাভ্যস্ত উদ্যত মাথা উঁচু ক'রে সাজ-পোশাক প'রে শ্রীহর্ষ বেরিয়ে পড়লো। ভেঙে পড়েনি সে, অসুস্থ সে নয়। বাজে কথা ! ভারী পা ফেলে ফেলে মোটরে গিয়ে উঠলো। একটি মুখ উঁকি মারলো দোতালার জানালা থেকে—জয়ার মুখ। শ্রীহর্ষ দেখে চোখ নাঁমিয়ে নিলে। মন ব'ললে তার, এই বৃষ্টি বাদলায় না বেরোলেই হ'তো। দীর্ঘ বিশ বছরের কর্মক্লান্ত সে। মনে মনে হিসাব ক'রলে শ্রীহর্ষ, বিশটি বছর সে ছুটি কাকে ব'লে—জানে না। একদিন কিছুই যদি না করে সে—কি এমন তাতে এসে যায় ! মন তার নিঃশব্দে কলরব করে উঠলো : সোফার, গাড়ী ফেরাও।

কিন্তু গাড়ী হু-হু ক'রে ছুটে চলেছে। শ্রীহর্ষ এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। আর অশান্ত একটা মন নিজের প্রচ্ছন্ন অতৃপ্তির মাঝখানে ঘুরপাক খেতে লাগলো। আজ তার প্রথম মনে হ'লো, কোনো ছেলে মেয়ে নেই তার। বয়স হয়েছে। এতদিন শুধু সে কাজের মধ্যে ডুবে ছিল—অসংখ্য কাজ। অর্থ, সমাজ, প্রতিপত্তি উঁচু হয়ে উঠেছে তার চার পাশে। এরই ফাঁকে একদিন সে দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রেছিল জয়াকে, যেমন অনেকে ক'রে থাকে আত্মীয় বন্ধুর অনুরোধের চাপে ; তারপর ?—তারপর সারা দিন এবং প্রথম রাত্রির অনেকখানি সময় শুধু কাজ—কাজ। রাত বারোটার পর অগাধ ঘুমের মধ্যে ক্লান্ত মস্তিকের অবসর। এর মাঝে মাঝে বাইরের সফর। এর

মধ্যে জয়া নেই। জয়ার স্পর্শ-করা একটি দিন-রাত্রিও যেন আজ মনে পড়ে না শ্রীহর্ষের। ধনী শ্রীহর্ষ তাকে বিয়ে ক'রে উদ্ধার ক'রেছে, সম্মান দিয়েছে—যেন এই-ই যথেষ্ট জয়ার পক্ষে।

অন্যায় ক'রেছে সে, শ্রীহর্ষের আজ প্রথম মনে হ'লো। ছুটি নেবে সে—অন্তত একটি দিন সব কাজ দূরে সরিয়ে রাখবে। ডাক্তারের উপদেশের উপরে জোর দিয়ে নিজেকেই যেন সে মনে মনে শুধোলে—কেন নেবে না ছুটি!

কিন্তু সোফার গাড়ী এনে থামাল লেকের ধারে, যেখানে অনেক-খানি যায়গা জুড়ে বাড়ী উঠছে শ্রীহর্ষের। কি ক'রবে শ্রীহর্ষ এখন? যন্ত্রের মতো নেমে পড়লো সে মোটর থেকে। দেখলো: ছুতোরমিস্ত্রী ধরণী চোখ বুজে নির্বিকারভাবে বিড়ি টানছে। সুরকি, মশলা আনতে এসে আঁটসাঁট গড়নের একটি মজুরণী আড়ালে দাঁড়িয়ে হেডমিস্ত্রী কানাইলালের সঙ্গে চোখে মুখে চাপা হাসি নিয়ে কি যেন কথা কইছে। কুলি-মজুরদের অলস-মন্থর হাঁক-ডাক—হঠাৎ এক-আধ কলি গান।

শ্রীহর্ষের দীর্ঘ চেহারার সুমুখে সব থেমে গেল হঠাৎ। ধরণী মিস্ত্রী চমকে উঠে তৎপর হাতে অকারণে কাঠের ওপরে এক ঘা হাতুড়ি ঠক ক'রে বসিয়ে দিলে। কানাইলাল ফুট নিয়ে সুমুখের দেয়াল মাপজোক করতে লেগে গেল। ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলো। অনেক আগে আসবার কথা ছিল তার—একটু দেরি হয়ে গেছে। ছোকরা সপ্রভিত কণ্ঠে ব'ললো, 'একটু দেরী হ'য়ে গেল মিঃ রায়। প্ল্যানের কি গোলমাল হয়েছে নাকি!'

শ্রীহর্ষ আস্তে আস্তে ব'ললো, 'আজ আর না সেন।'

সেনের মুখ শুকনো হ'য়ে গেল। সে ভালো ক'রেই জানে, এই

শ্রীহর্ষ লোকটা ঘড়ি ধ'রে কাঁটায় কাঁটায় কাজ করে—সময় সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে না। আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে ব'ললো, 'এমন বেয়াড়া কাজ একটায় আটকে গেলুম—ছিঁচকে কাজ। দেরী হ'য়ে গেল একটু।'—

'আজ ওসব থাক সেন।' বলে গম্ভীর মুখে গাড়ীতে উঠে ব'সলো শ্রীহর্ষ। সোফার গাড়ীতে স্টার্ট দিলে।

এত বড়ো কাজ, এত টাকা, গেল বুঝি সব। ইঞ্জিনীয়ার ছোকরার কান্না পেল। আবার বললো অনুনয় করে, 'দেরি হয়ে গেল আমার। যাক—কতক্ষণই বা লাগবে আর। দেখে দিয়ে যান একটু।'—

মহাবিরক্ত হয়ে তাকালো শ্রীহর্ষ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে। ইঞ্জিনিয়ারের চোখে ভয়। আরও বিরক্ত হলো শ্রীহর্ষ। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ব'সে রইলো। কাজ, কাজ—শুধু কাজ! কাজের মধ্যেই যেন ডুবে থাকতে হবে তাকে চিরদিন, এবং একা। হ্যাঁ, শ্রীহর্ষের আজ প্রথম মনে হ'লো সে একা-অসংখ্য কাজের মধ্যে, অনেক লোকজনের মধ্যে। সকলে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সকলে যেন তার সুমুখে না আসতে পারলেই বাঁচে। শ্রীহর্ষের অতো বড়ো বাড়ীটার প্রত্যেকটি খুপ্‌রি আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনে পরিপূর্ণ—তাদের সহৃদয় অন্তরঙ্গতা এতটুকুও মনে পড়লো না তার। আশ্চর্য, জয়ার নামটাও এই সূত্রে মনে পড়লো না শ্রীহর্ষের। মনে পড়লো সকালের সেই চোখ-বাঁধা বড়ো মেয়েটিকে, তার সুন্দর মুখের ভীরু পাণ্ডুরতাটি। কিন্তু তার নাম কোনো রকমে মনে ক'রে উঠতে পারলো না শ্রীহর্ষ। তবু তাকে ঘিরে তার এতদিনকার সমস্ত

দুর্বলতা হঠাৎ আজকের দিনটিতে এসে বুকের মধ্যে উছলে উঠলো। তার লক্ষ্যহারা অতৃপ্ত মনের মাঝখানে শুধু যাকে পেল—তাকেই খুশি ক'রে দিতে ইচ্ছে হ'লো। নিজের খেয়াল-খুশি-মতো সোনা-রূপো নানা জিনিসে পকেট ভর্তি ক'রে বাড়ী ফিরলো শ্রীহর্ষ। বাড়ীর কাছাকাছি এসে শ্রীহর্ষের মোটর হঠাৎ থামলো রাস্তার একপাশে। বাক্স, বিছানা, স্যুটকেসে বোঝাই খান দুই ট্যাক্‌সী রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি বৃদ্ধ লোক ব'লছে, 'গিয়েই চিঠি দেবে।'

বোধ করি, কেউ বাইরে যাচ্ছে। সুমুখে দীর্ঘ ছুটি। সে-ও তো বাইরে কোথাও যেতে পারে? মনে মনে ভাবলে শ্রীহর্ষ, মনে মনে ব'ললে, ক'লকাতার বাইরেই কোথাও যাবে সে। ক'লকাতায় বিশ্রী লাগছে তার।

গেটের মধ্যে মোটর ঢুকলো। শ্রীহর্ষ মোটর থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে সোর্জা চলে এলো তার ঘরে।

পেছনে পেছনে বেয়ারাও এলো—শ্রীহর্ষের সুমুখে একখানি কার্ড তুলে ধরলো। শ্রীহর্ষ কার্ডের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহাবিরক্ত হ'য়ে উঠলো, চন্দ্রপুরার সেই অভ্রখনির ব্যাপারে ভদ্রলোকটি এসেছে—আসবার কথাও ছিল তার। কিন্তু মনের তিক্ততা চেপে রাখতে পারলে না শ্রীহর্ষ—চেঁচিয়ে ব'লে ফেললে, 'বলে দে—আজ কোনো কথা হবে না।'

অকারণে ধমক খেয়ে বেয়ারাটা যেন পাথর হয়ে গেল।

শ্রীহর্ষ আবার চিৎকার ক'রে উঠলো, 'যা।'

বেয়ারা ছুটে চ'লে গেল।

ঘরে শ্রীহর্ষ একা, আর ঘরের বাইরে জয়া নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। শ্রীহর্ষের অভ্যাসবিরুদ্ধ এই চেঁচামেচি, অসময়ে হঠাৎ শোয়ার ঘরে ঢোকা সবগুলো আজ কেমন যেন দুর্বোধ্য লাগলো জয়ার। হয়তো লোক-টার খুব মোটা টাকাই কোথাও মার খেয়েছে। ভাবলো জয়া। সপ্তাহ দুই আগে বোম্বেতে শ্রীহর্ষ বিশেষ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল, এ-খবর বাড়ীর কেউ জানে না। জয়াও জানে না। কোনো খবর কারুকে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি শ্রীহর্ষ—মনেও হয়নি তার। এই বিত্তশালী, সম্মান প্রতিপত্তিশালী মস্ত লোকটার চারদিকে দীর্ঘদিন ধ'রে অনেক ব্যবধান গড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে সকলের মাঝখানে—সকলের সঙ্গে।

ভয়ে ভয়ে জয়া ঘরে ঢুকলো—যেমন ক'রে অনেক গভীর রাতে নিঃশব্দে সে তার পাশের ঘর থেকে শ্রীহর্ষের ঘরে এসে ঢুকেছে। দেখেছে—ঘুমে আত্মহারা শ্রীহর্ষ। জয়ার কোনোদিন কোনো ফোঁপানীর আওয়াজই তাকে জাগিয়ে তোলেনি।

শ্রীহর্ষ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

জয়া মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তোমার কি শরীর অসুস্থ ?'

একটি নারী কণ্ঠের দরদ ভালো লাগলো শ্রীহর্ষের—কিন্তু অসুস্থ কথাটায় সর্বাঙ্গ তার জ্বলে উঠলো। শুধু কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে তাকে—তার কোনো ছুটি নেই যেন !

শ্রীহর্ষ জয়ার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো, 'অসুখ করেনি—তবে ভালো লাগে না আর অতো ঝঞ্ঝাট। ভালো লাগছে না এখানে। বাইরে কোথাও যাবে জয়া ?'

জয়া কি উত্তর দেবে, ভেবে পেল না। শ্রীহর্ষ আজ ভয়ানক

দুর্বোধ্য। এ যেন হঠাৎ কোনো একজন স্বল্প-পরিচিত পুরুষ-বন্ধু তার কাছে প্রেমনিবেদন ক'রে ব'সলো!

শ্রীহর্ষ তাকিয়ে রইলো জয়ার অবাক মুখের দিকে। জয়ার মসৃণ দুটি বাহুতে, কণ্ঠে, মুখে—সর্বদেহে কমনীয় যৌবনের উদ্ধত বিকাশ। এখনও বয়স তার ত্রিশ পেরোয়নি। জয়াকে আজ নতুন ক'রে ভালো লাগলো শ্রীহর্ষের।

চলে যাবে সে কোথাও জয়াকে নিয়ে। কিন্তু কোথায়?

জয়া আস্তে আস্তে বললো, 'কোথায় যাবে?'

শ্রীহর্ষের সমস্ত আবার গোলমাল হয়ে গেল। চন্দ্রপুরা নামটা মনে এলো শুধু। ব'লে ফেললো, 'কেন—চন্দ্রপুরা!'

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো শ্রীহর্ষের: চন্দ্রপুরায় তার নতুন কেনা অভ্রখনি আছে বটে—কিন্তু থাকবার জায়গা নেই, অধিকন্তু বাঘ-ভালুক আছে। বিব্রত শ্রীহর্ষ বললে, 'তুমিই ঠিক করো কোথায় যাওয়া যায়। কালই বেরিয়ে পড়বো।'

তারপর রাঁচী এসে পৌছুলো ওরা।

একদিন হুন্‌ড্রুপ্রপাত দেখতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল সস্ত্রীক রবীন চৌধুরীর সঙ্গে।

রবীন বললো, 'জয়া—তুমি! কতোদিন পরে দেখা! ভালো আছো?'

রবীনের সাগ্রহ প্রশ্ন আর জয়ার সলজ্জ সপ্রতিভ উত্তর ভালো লাগলো না শ্রীহর্ষের। তবু পরস্পরের আলাপ-পরিচয় হলো ওদের। শ্রীহর্ষের মতো কৃতকর্মা বিরাট একটা লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে

সস্ত্রীক রবীন চৌধুরী ভারী খুশি হ'লো। শ্রীহর্ষ তার মধ্যে শক্ত হয়ে রইলো শুধু। আড়ষ্ট।

কথায় কথায় রবীন তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'জানো—আমার গানের প্রথম সার্টিফিকেট পাই জয়ার কাছ থেকে। আর ওইটেই শেষ।' তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'তোমার মতো সমঝদার আর পাইনি জয়া।'

কি আর বলবে জয়া—নিঃশব্দে একটু হাসতে পারে শুধু। কিন্তু হঠাৎ শ্রীহর্ষের উদ্যত সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সুমুখে কুঁকড়ে গেল সে।

শ্রীহর্ষ বললো, 'আচ্ছা—চলি এবার—'

অত্যন্ত খারাপ লাগছে শ্রীহর্ষের। তবু জয়া রবীনের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সস্মিত মুখে বললো, 'আমাদের ওখানে আসবেন একদিন।'

তারপর ওরা বিদায় নিলে।

সারাটা পথ শ্রীহর্ষ শুধু ভাবতে ভাবতে এলো: রবীন লোকটা কে! জয়ার সঙ্গে আলাপটাই বা তার কি রকমের! অনেকবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে জয়াকে। কিন্তু পারলো না। হাজারটা প্রশ্ন তার উষ্ণ মস্তিষ্কে ঘুরতে লাগলো। প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ প্রেমিকের মতো।

সারাটা রাত্রি বিশ্রী এক অস্বস্তির মধ্যে ছটফট করতে লাগলো শ্রীহর্ষ। কলকাতায় থাকতে কলকাতার বাইরেটা দুর্নিবার বেগে টানছিল শ্রীহর্ষকে। ছুটে এসেছিল জয়াকে নিয়ে নতুন করে জীবনের অধ্যায় শুরু করবার জন্যে। নিতান্ত একটা সাধারণ মানুষ হওয়ার জন্যে। কিন্তু সমস্ত নতুনত্বের মোহ ছুটে গেল শ্রীহর্ষের। রবীনের উপস্থিতিতে রাঁচীর আকাশ-বাতাস একদিনেই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে

যেন তার কাছে। বিশ্রী একটা উত্তাপের জ্বালা আস্তে আস্তে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। শ্রীহর্ষের হঠাৎ এক সময়ে মনে হলো, জয়াও যেন জেগে আছে।

শ্রীহর্ষ নীরস কণ্ঠে শুধালো, 'ঘুমাওনি জয়া!'

'না'। জয়ারও ঘুম আসছে না। ঘুমোতে পারছে না সে।

কেন ঘুমোতে পারছে না সে—কি ভাবছে সে! গভীর অন্ধকারে জয়ার দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলে দিয়ে অসহায়ের মতো চেয়ে রইলো শ্রীহর্ষ। রবীনকে হয়তো ভালোবাসতো জয়া—আজও ভালবাসে।

দেহ-মনের অপরিমিত অবসাদ আর মাথার দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে শ্রীহর্ষের ভোর হলো। ব্লাড-প্রেশারের রোগী। উত্তরহীন অসংখ্য জটিল প্রশ্ন আর সারা রাত্রি অনিদ্রা। শ্রীহর্ষ অসুস্থ হয়ে পড়লো।

ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জয়া জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার শরীর কি খারাপ?'

বেশ অসুস্থ শ্রীহর্ষ। কিন্তু কি উত্তর দেবে সে! একবার ইচ্ছে হলো, বোম্বেতে গিয়ে বিশেষভাবে সে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—বলে সে কথা। বলে: ভয়ানক দুর্বল সে। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে কায়াহীন নবীন আবেগ একটা গড়ে উঠছে, সে যেন সহস্র কণ্ঠে কলরব করে উঠতে চাইলো, না—সে দুর্বল নয়। সে অসমর্থ নয়।

শ্রীহর্ষ সোজা হয়ে উঠে বসলো। জয়ার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো কাছে। সমস্ত দুর্বলতাকে জোর করে দূরে ঠেলে দিয়ে হাসলো শ্রীহর্ষ। বললো, 'কেন,—বেড়াতে যাবে?'

অনেক জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে জয়া ভয়ে ভয়ে তাকালো শ্রীহর্ষের

দিকে। মনে মনে ভাবলো সে: কি ইঙ্গিত করছে লোকটা? জয়ার মুখ দিয়ে শুধু একটি কথা খসে পড়লো, 'না।'

মনে মনে ক্ষুন্ন হলো শ্রীহর্ষ: না—অসুস্থ সে। তবু আদর করে বললো, 'কেন—চলো না—হুনড্রুর দিকে।'

বলেই দু-জন তাকালো দু-জনের দিকে। দু-জনেই ভাবলো—রবীনের কথা ভাবছে কি?

ভদ্রতা আর শালীনতা আজ যেন চাবুক কষায় শ্রীহর্ষকে।

বিকেলের দিকে সস্ত্রীক রবীন চৌধুরী এলো আবার।

জয়া তাদের অভ্যর্থনা করলো।

শ্রীহর্ষ নিজের ঘরে ইজি-চেয়ারে চুপচাপ পড়ে রইলো। ওদের সঙ্গে দেখা করবার কোনো ইচ্ছে নেই তার—শরীরও দুর্বল। ওদের আলাপ-আলোচনা, ছেঁড়া-টুক্‌রো উচ্ছল হাসি, রবীনের ভারী গলার স্বাস্থ্যকর উল্লাস যেন দম্‌কা ঝড়ের মতো শ্রীহর্ষের নির্জন ঘরে এসে সমস্ত তছ্‌নছ করে দিলে।

শ্রীহর্ষ শুনতে পেল—রবীন বলছে, 'মিস্টার রায় কোথায়?'

জয়া মৃদু কণ্ঠে কি বললো—শুনতে পেল না শ্রীহর্ষ ঠিক। তবু যেন সে স্পষ্ট শুনতে পেল জয়ার গলা: 'অসুস্থ।'

অসহ্য! রবীন কি জোরে হাসে! শ্রীহর্ষ সোজা উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু সুমুখের দরজা দেখতে পেল না সে। ঘরের আসবাবপত্র, রাঁচির দিগন্তবিসারী প্রান্তর, পরিচ্ছন্ন আকাশ—সব যেন ঘুরছে। শ্রীহর্ষ ইজি-চেয়ার ধরে বসে পড়লো। অসহায়ের মতো অনেকক্ষণ বসে রইলো সে। ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গেছে হঠাৎ।

অবশেষে অর্গানের সঙ্গে রবীনের সুন্দর গলাটা যখন সমস্ত বাড়ীটার মাঝখানে ছড়িয়ে পড়লো—শ্রীহর্ষ তখন আর বসে থাকতে পারলো না। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নীচে।

বিরস হাসি হেসে শ্রীহর্ষ বললো, 'এই যে—আপনারা এসেছেন। ভারী খুশি হলুম—ভারী খুশি হলুম।'

মিসেস্ চৌধুরী সপ্রতিভ হাস্যে বললো, 'বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়লুম।'

'বেশ, বেশ।'

তারপর চুপ করে বসে রইলো শ্রীহর্ষ। রবীন অনেক কথা কইলে, রবীনের স্ত্রী অনেক কথা কইলে। জয়া যেন কেমন জড়োসড়ো হয়ে রইলো। ভালো লাগলো না শ্রীহর্ষের। নিজে সে একটি কথাও কইতে পারলে না। ওদেরই আলাপ-আলোচনার ঝড়ের মাঝখানে ওরা যেন খড়-কুটোর মতো উড়ছে। শ্রীহর্ষ পড়ে আছে যেন অনড় অচল পাথর একখানা, নিঃশব্দ—প্রাণহীন। বার বার সে রবীনের দিকে তাকালো—আর জয়ার দিকে তাকালো। ওদের জয়োদ্ধত দেহ, ওদের মসৃণ উজ্জ্বল মুখ ভয় করে শ্রীহর্ষ। রবীনকে ভয় করে—জয়াকে ভয় করে—যৌবনকে ভয় করে শ্রীহর্ষ। বরং ঠিক সেই মুহূর্তে ঘৃণা করে—ওদের সকলকে সে ঘৃণা করে। রবীনের ছোট ছেলেটিকে কোলে টেনে নিয়ে সশব্দে চুমু খেল শ্রীহর্ষ। ভারী সুন্দর ছেলেটি! ছেলেটাকেই আঁকড়ে ধরে যেন শ্রীহর্ষ।

শ্রীহর্ষ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এর বয়স কতো হ'লো মিসেস্ চৌধুরী?'

মিসেস্ চৌধুরী হেসে ব'ললো, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন। ওর কাকা ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এত দুষ্টু, সব মনে ক'রে রেখেছে!'

'বটে!' শ্রীহর্ষ আদর ক'রে আবার চুমু খেল।

'শুনবেন?' মিসেস্ চৌধুরী ছেলের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, 'এই খোকা, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর জিনিস কি রে?'

খোকা ব'ললো, 'মেয়ে।'

'সব চেয়ে বড়ো কবি কে?'

'খৈয়াম।'

'সব চেয়ে ভালো জিনিস কি?'

'মদ।'

সকলরবে সকলে হাসতে লাগলো—শ্রীহর্ষও হাসলো। সত্যিই হাসলো। ছেলেটিকে তার ভারী ভালো লাগছে।

'আরও আছে', রবীন বললো, 'তোমার বয়স কত খোকা?'

খোকা বললো, 'এক শ।'

সকলে হাসলো আবার। শুধু হাসতে গিয়ে শ্রীহর্ষের মুখটা বিকৃত হ'য়ে গেল এবার। তার আর কিছুই ভালো লাগলো না। রবীন লোকটাকে এতটুকুও পছন্দ করে না সে।

তবু রবীন এলো তারপর দিন—একা।

শ্রীহর্ষ ব'সে রইলো নিজের ঘরে পাথরের মতো। আকাশে বিকেলের ছায়া কালো হ'য়ে এলো। সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশ বেয়ে, সুমুখের প্রান্তর বেয়ে শ্রীহর্ষের ঘরে ঘন হ'য়ে এলো। অদম্য কৌতূহল হলো—নীচে নেমে যেতে। কি কথা কইছে রবীন আর জয়া; কতো পুরাতন দিনের কথা কইছে তারা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল! কি

ক'রছে ওরা এখনো! এখান থেকে পালাবে সে—এখানে আর একটুও ভালো লাগছে না তার। বহু দূরে কোথাও পালাবে—যেখানে রবীন নেই। জয়াকে একা পেতে চায় সে। সেখানে কোথাও জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেবে তারা। বর্ষা সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে নিজেকে বড়ো একা মনে হ'লো তার—বড় উপেক্ষিত ব'লে মনে হ'লো। আর বড়ো দুর্বল সে। বোম্বের সেই ডাক্তারের কথা মনে হ'লো: চলে যান না সুইজারল্যাণ্ড! অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি কি অভাব আপনার? এবার অবসর নিন। অবসর।—

জয়া যখন ঘরে ঢুকলো—তখুনি ব'লে ফেললো শ্রীহর্ষ, 'সুইজারল্যাণ্ড যাবে জয়া?'

শ্রীহর্ষের রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইলো জয়া অবাক চোখে।

শ্রীহর্ষ অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললো, 'এখানে আর ভালো লাগছে না। চলো—কালই বোম্বে রওয়ানা হই। তারপর ওখান থেকে যতো শীগ্‌গির পারি—পাড়ি দেবো।'

জয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। শ্রীহর্ষ একেবারে নতুন তার কাছে। অস্থির কর্মচঞ্চল—দুর্বোধ্য। তাকে শুধু দেখে যাওয়া—শুধু শুনে যাওয়া।

শ্রীহর্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লো। বললো, 'আমার স্বাস্থ্য বড়ো খারাপ, ডাক্তার বলেছিলো—গেলে ভাল হয়।'

শ্রীহর্ষ শুধু এইটুকু ব'ললো—জয়ার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ব'ললো, 'এখানে এসে ব'সো একটু।'

জয়া শ্রীহর্ষের পাশে এসে ব'সলো।

শ্রীহর্ষ নিজের অবসন্ন হাতের মধ্যে জয়ার একটি হাত টেনে নিলে। আর ব'ললো, 'অনেক কাজ ক'রেছি—এবার নির্ভাবনায় দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চাই।' ম্লান হেসে তারপর ব'ললো, 'সে ভার তোমার। এখান থেকে কালই রওয়ানা হবো। কি বলো?'

পরিপূর্ণ সম্মতির জন্যে জয়ার মুখের দিকে সাগ্রহে শ্রীহর্ষ চেয়ে রইলো।

ভোর হ'লো। ক'লকাতা থেকে শ্রীহর্ষের ম্যানেজার সদানন্দ এসে পৌঁছলো।

সদানন্দ ব'ললো, 'কবে ফিরবেন কোলকাতায়?'

শ্রীহর্ষ হেসে ব'ললো, 'পালাও সদানন্দ। কবে ফিরবো আর না ফিরবো—ওসব খবর আর আমার কাছে জানতে চেয়ো না। তোমাদের হার হাইনেস যদি শুনতে পায় একবার—আমাকে ফের ক'লকাতায় নিয়ে যেতে এসেছো, তা' হ'লে আর রক্ষে নেই হে। চাকরী যাবে—পালাও।'

দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় শ্রীহর্ষের এই হাল্‌কা কথাবার্তা একেবারে নতুন সদানন্দের কাছে। সে একেবারে জড়োসড়ো হ'য়ে মুখ নীচু ক'রে রইলো। শ্রীহর্ষের মনে কিন্তু কোনো অতীত নেই আজ—সে আজ একেবারে নতুন মানুষ, একেবারে সাধারণ। কাল রাতে জয়ার কাছে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে মেলে দিয়েছে সে—দিয়ে খুশি সে। সকলের মতো জয়াও তাকে ভয়ে, শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে রাখবে—এ সে চায় না। আজ কারও কাছেই সেটা চায় না

শ্রীহর্ষ। সহজ হ'তে চায় সে। আজ ভোরে মনে হচ্ছে তার, অনেক উঁচু থেকে নেমে এসে সহজ হ'য়ে গিয়েছে সে, একেবারে স্বাভাবিক। শ্রীহর্ষ নিঃশব্দে হাসিমুখে চেয়ে রইলো সদানন্দের দিকে। জয়া ওদিকে বোম্বে যাওয়ার তোড়জোড় ক'রছে।

শ্রীহর্ষ হেসে ব'ললো, 'অমন মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে থেকো না বাপু। কথা কও। আমি কি বাঘ না ভাল্লুক, তোমরা অমন ক'রে থাকো! কথা কও।'

সদানন্দ মাথা চুলকে শুধু ব'ললো, 'কবে যাবেন তা হ'লে ?'—

'যাব কি হে! পালাও। স্রেফ পালাও।'

'মানে—'

'মানে ?'

অনেকগুলি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সদানন্দ। একটা ব্যাংক ফেল মেরেছে শ্রীহর্ষের মাথায় তিন লাখ ছাপ্পান্ন হাজার ঋণ দাঁড় করিয়ে। দুঃসময় নাকি একা আসে না। শ্রীহর্ষের সেলুলয়েড ফার্মে আগুন লেগে অনেক ক্ষতি হ'য়েছে। এর ওপর কলিয়ারীর মজুররা তো অনেকদিন থেকেই ধর্মঘট নিয়ে হ্যাঙ্গাম ক'রছে। সেটা এসেছে একটু সুরাহার পথে। শ্রীহর্ষ—কর্মাভিজ্ঞ শ্রীহর্ষের ঠিক এখনই ভয়ানক প্রয়োজন। প্রয়োজন সর্বত্র।

একটা বাষ্পীয় উত্তাপ শ্রীহর্ষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। শ্রীহর্ষ পাগলের মতো ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগলো।

'সর্বনাশ করেছ সদানন্দ—এ্যাঁ, সব গেল যে! সদানন্দ—মোটরে যাবো—এক্ষুনি বেড়িয়ে পড়বো। সোফার—সোফার—রঘুবীর—'

তর্‌-তর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো শ্রীহর্ষ। এক ধাপ, ছু-ধাপ, তিন ধাপ। টল্‌তে টল্‌তে শ্রীহর্ষ পড়ে গেল।

সদানন্দ চীৎকার ক'রে উঠলো, 'এই রঘুবীর!—ডাক্তার—'

পৃথিবীটা শুধু ঘুর্‌ছে শ্রীহর্ষের নিষ্প্রভ চোখের সুমুখে। নিরবচ্ছিন্ন—বিরামহীন। আশ্চর্য! ঘুরেই চলেছে কি দুর্বার বেগে!

উ[illegible] [illegible]বার

স্লিপার ঘষটানো এক জোড়া দ্রুত পায়ের শব্দ হু হু করে এগিয়ে আসছে রমেশের ঘরের দিকে। ওই দুটো হুড়মুড়ে পায়ের শব্দ চেনা হয়ে গেছে রমেশের। সকাল থেকে ওই দুটো পা আনাগোনা করেছে বহুবার। ললিতের সঙ্গে জেল-গেটে গিয়েছিল। এখানে আসার পরে তার ঘরে এসেছে কয়েক বার। রান্না ঘরে বৌদির কাছে গেছে—কয়েকবার এসেছে ললিতের খোঁজে। দূর থেকে ও পায়ের শব্দ শুনেই রমেশ বলে দিতে পারে—ও হলো সেই পাশের বাড়ীর মেয়েটি, বাসনা যার নাম। ইতিমধ্যে কুমুদিনীর কাছ থেকে ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছে রমেশ। ভালো লাগেনি।

চটি ঘষটানো মেয়েটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, আর রমেশের মুখটা ঘুরে গেল একেবারে উল্টো দিকে। মুখের পেশীগুলো সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠলো ঝড় জল খাওয়া ব্রোঞ্জে গড়া কোনো সৈনিক মূর্তির মতো।

কুমুদিনী হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েন রমেশের এই ব্যাপারে। রমেশের পাশেই বসেছিলেন একটা চেয়ার টেনে—বাসনার দিকে চেয়ে অত্যন্ত বিব্রত, আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। ঘরের এই অনাত্মীয়

আবহাওয়া হয়তো বাসনাকে স্পর্শও করলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'বৌদি—ললিত ফেরেনি ?'

এই নিয়ে পাঁচবার হলো ললিতের খোঁজ।

একটু ফিকে হেসে কুমুদিনী বললেন, 'না তো ! ··· সারাদিন গেল —নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। তার দাদাকে পৌছে দিয়েই সেই যে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে সে বলতো ?'

কুমুদিনীর উল্টো প্রশ্নে বাসনা হেসে বললো, 'আমি কি করে জানবো !'

'জানিসনে তুই !' কুমুদিনী তরল মেয়েলী গলায় বললেন, 'তখন যে কি কথা হচ্ছিল তোদের ? তুই বললি—যাবি। সে বলে গেল —এখন কিছুতেই না, বিকেলে।'—

বাসনা হেসে বললো, 'ওই পর্যন্তই বৌদি। বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং আছে, বলেছিল—এক সঙ্গে যাবো। কিন্তু বিকেল তো হলো ; দেখুন না—ললিতেরই দেখা নেই।'

বাসনা যেমন হুড়মুড় করে এসেছিল তেমনি করে চলে গেল।

'ললিত !' রমেশ কেমন বাঁকা ভাবে বললো, 'ললিত ওর চেয়ে বয়সে বোধ হয় বড়ই হবে ?'

'তা হবে।' কুমুদিনী সপ্রতিভ ভাবে বললেন, 'বছর দেড়েকের বড় হবে হয়তো। ললিতের হলো ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার আর ও এবার বি. এ. দেবে।'

কুমুদিনীর কথাগুলো শোনায় যেন কৈফিয়তের মতো। সে কথা রমেশের কানে যেন ঢোকেই না। রমেশ বললো, 'ছোটরা আমাদের সময়ে বড়দের দাদা বলে ডাকতো।'

কুমুদিনী এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে সহজ করে দেওয়ার জন্যে হেসে বললেন, 'বাবা—তোমাদের দলের মধ্যে' তো সবাই দাদা। নেতা মাত্রই দাদা।'

'আমাদের ছেলেরা নেতাদের শ্রদ্ধা করতো, বড়দেরও।'—

রমেশের এই রকম চাপা চাপা ভারী ভারী কথার পরে কুমুদিনী চুপ করে যান।

রমেশ সোজা বলে ফেললো তারপর, 'মেয়েটা যেন কি রকম।'

কুমুদিনী এবার বিব্রত ভাবেই যেন রমেশের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ওকে ছোটবেলা থেকেই ওই রকম দেখছি। একটু চঞ্চল ও।'

রমেশ একটু হেসে বাঁকা ভাবে বললো, 'কি জানি, আমি অন্ধ মানুষ—সব কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আমার কি মনে হচ্ছে জান বৌদি?—সব যেন কেমন হালকা, কেমন পলকা—সব যেন ওই রকম অস্থির। জেলের বাইরে এসে মনে হচ্ছে—পৃথিবীটা কি বিশ্রী ভাবে বদলে গেছে বিশ বছরে!'

কুমুদিনী কোনো কথা বলেন না। রমেশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন—ভয়ানক গুরুগম্ভীর দেখায় তাকে। নাকের দুপাশ দিয়ে গালের ওপরে গভীর হয়ে পড়েছে বয়সের বলিরেখা ঘোড়ার জিনের মতো, থুত্‌নিটা ঝুলে পড়েছে কিছুটা, দেহে প্রৌঢ়ত্বের প্রসারতা। রমেশ কি যেন ভাবছে। ভাবতে ভাবতে বিরক্ত গম্ভীর মুখটা প্রসন্নতায় ভ'রে উঠছে আস্তে আস্তে। বিশ বছর পরের বিশ্রী পরিবর্তিত পৃথিবীটার মাঝখানে ভালোলাগার কি একটা পেয়ে গেছে যেন সে তার অন্ধ চোখের সামনে।

হ্যাঁ—সে তার অতীত।

রমেশ বলে উঠলো, 'মৃণালকে তোমার মনে পড়ে বৌদি—সেই যে রিভলভার সমেত ধরা পড়লো ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ডারসনকে গুলি করতে গিয়ে ?'

কুমুদিনী বললেন, 'খুব মনে পড়ে। পাহাড়ীপুরের বাড়ীতে তোমার সেই কোণের ঘরে প্রায়ই আসতো যেতো। তখন কে জানতো তার মধ্যে অতো ছিল। হাতে বই খাতাপত্তর থাকতো—ভাবতুম তার মাস্টার মশায়ের কাছে পড়া জানতে এসেছে।'

আজ বিশ বছর পরে সেই মেয়েটিই যেন গম্ভীর মুখে খাতাপত্র নিয়ে এসে দাঁড়ায় রমেশের অন্ধ দুই চোখের সামনে—তার পেছনে আর সব কিছু আড়াল হয়ে যায়, হালকা পলকা তুচ্ছ হয়ে যায় বাসনারা।

রমেশ সোৎসাহে বললো, 'সেই একদিনের কথা মনে পড়ে বৌদি—পুলিস যেদিন প্রথম খানাতল্লাস করতে এলো আমাদের বাড়ী ? মৃণাল তখন আমার ঘরে। সেইদিনই হয়তো ধরা পড়তুম মৃণাল না থাকলে।'

কুমুদিনী চুপ করে শুনছেন।

রমেশ বলে চললো, 'একেবারে নতুন আমদানী তিন-তিনটে রিভলভার সেদিন আমার ঘরে। মৃণাল চারদিক দেখে এসে বললো—পেছনের গলির দিকে মাত্র দু-জন, গুলি করে বেরিয়ে যাই চলুন রমেশ দা। সেদিন তার সাহস দেখে অবাক হয়েছিলাম বৌদি।'

মৃণাল সেদিন রিভলভার তিনটে ব্লাউজের ভেতরে গুঁজে রমেশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কুমুদিনী সেদিন কিছুই জানতেন না।

রমেশ মৃণালের কথা শেষ করলো আচ্ছন্ন দুটি কথা দিয়ে, 'আশ্চর্য

মেয়ে!' তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'জেল থেকে তোমার কথাও শুনেছি, বৌদি। দলের সব যখন একে একে ধরা পড়ে জেলে এলো —তাদের মুখে শুনতুম তোমার কথা।'

সে কথায় কুমুদিনী কেমন যেন লজ্জিত, সঙ্কুচিত হন। তবু রমেশ টান মারছে তাঁকে সময়ের সুগভীর এক তলায়; আস্তে আস্তে কুমুদিনীও তলিয়ে যান।

রমেশ বললো, 'আচ্ছা, পুলিস সুপারিনটেনডেণ্টের বৌয়ের কাছে সেই নতুন মাটির সরায় করে আতপ চাল কাঁচকলা আর থান কাপড় পাঠানো কি তোমার বুদ্ধি?'

কুমুদিনী হেসে বললেন, 'পাজি লোকটা বেয়াড়া অত্যাচার চালিয়েছিল সে সময়ে। ও ব্যাপার নিয়ে সে আবার এক কাণ্ড। সুপারিনটেনডেণ্ট ছিল মুসলমান তো—তার বৌ ওই সব জিনিসপত্তর পেয়ে বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা কি। সে আবার সরকারী উকিলের বৌকে পাঠিয়ে রটিয়ে আসতে হয়েছিল—হিন্দু বাড়ীর বিধবাদের ওই সব খেতে পরতে হয়: কমিশনারের বৌ বিধবা হবে শিগগির, সাবধান না হলে। ভয় পেয়ে তারপর মেয়েটার সে কি কান্নাকাটি! স্বামীকে ধরে পড়লো।—বদলীর দরখাস্ত কর।'

রমেশ বললো, 'ব্যাপারটা শুনেই আঁচ করেছিলাম—এতে মেয়েলী হাত আছে।'

কুমুদিনী বললেন, 'বাবা! সে একদিন গিয়েছে। শেষ ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসতে হলো কলকাতায়। তোমার দাদা ও সব কিছু বুঝতেন না—নিরীহ শান্ত মানুষ। তিনিও ক্ষেপে উঠলেন পুলিস যখন আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করলো।'

কেউ আর কোনো কথা বলে না। সুদূর এক অতীত তার একদিনের সমস্ত কথা ও কাহিনী নিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় ঘরের মাঝখানে রমেশের আহ্বানে।—তার যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় কুমুদিনীও রমেশের সঙ্গে সঙ্গে যেন অভিভূত হয়ে বসে থাকেন। দু-পাশের বড় বড় বাড়ীগুলির গা বেয়ে তখন বিকেলের বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসছে। ঘরের মধ্যে ওই রকম একটি শান্ত বিষণ্ণ ছায়া—মনের গভীর পর্যন্ত যা স্পর্শ করে।

তবু একান্ত অনিচ্ছায় রমেশকে যেন ফিরে আসতে হয় পরিবর্তিত বর্তমানে। নিরাসক্ত ভাবে রমেশ বললো, 'ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কি মিটিং আছে বলছিল না বাসনা?'

কুমুদিনী হেসে বললেন, 'ললিতের ও সব খবর বাসনাই রাখে। আমি ও সবের কিছুই জানিনে। ছেলেপুলে ঘর-সংসার নিয়ে পারিনে আর। বাসনা পড়াশোনা টুকিটাকি নিয়েই ছিল—সে দেখি কবে থেকে ললিতের পেছনে পেছনে ওই সব নিয়ে মেতে উঠেছে।'

রমেশকে অন্যমনা মনে হয়। হঠাৎ সে বলে বসলো, 'ওরা বোধ হয় ভালোবাসে—না বৌদি? মানে—'

ওরা মানে কারা বুঝেছেন কুমুদিনী। বললেন, 'কেমন করে জানবো?'

'তুমি জানো না বলতে চাও?'

'হয়তো হবে।' কুমুদিনী বিব্রত বোধ করেন। বললেন, 'ঠিক জানিনে। পাহাড়ীপুরের সেই এক কোণের ঘরে বসে তুমি সায়েব মারার ষড়যন্ত্র করতে—মৃণাল আসতো যেতো! ওরাও তেমনি দু-জন মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে। চেঁচায়। তখন মৃণালকে দেখে শাশুড়ী

ঠাকরুণ ভাবতেন, মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে—বিয়ে করবে হয়তো।'

কথার মাঝখানে রমেশ বলে উঠলো, 'ছি বৌদি, মৃণাল আমার ছাত্রী।'

রমেশের মুখের দিকে চেয়ে কুমুদিনী চুপ করে গেলেন। সে মুখ এক মহিমায় বদলে কঠোর হয়ে উঠেছে। তার দলের কড়া নিয়মনিষ্ঠা, সংযম আর কাঠিন্য সবগুলো যেন ফুটে উঠেছে রমেশের প্রৌঢ় আধবুড়ো মুখে কঠিনতর হয়ে। তার যুগের দুর্বলতা সে আজও যেন এতটুকু সহ্য করতে রাজী নয়। তবে এ যুগের কথা আলাদা—বাসনাদের যুগ: হালকা পলকা অস্থির।

কুমুদিনী কথায় কথায় বলেন গত তিন বছরের কলকাতার কথা। সারা শহটা যেন একটা বারুদখানা। শুরু হোলো মিলিটারি ফৌজের সঙ্গে সাধারণ মানুষের লড়াই, বড় বড় মিছিল; স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ—সবাই যেন ক্ষেপে উঠেছে। শুধু ললিত নয়, তার পেছনে পেছনে শুধু বাসনাই নয়—ওই রকম হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, হাজার হাজার লোক। তারপর হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধ। কেমন এক অভাবনীয় ভাবে রূপ বদলে গেল যেন যুদ্ধক্ষেত্রের।

শুনতে ভালো লাগে না রমেশের। বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, 'তারপর বিপ্লবী বীরপুরুষেরা নিরস্ত্র মানুষদের ধরে ধরে মেরেছে।'

'না না—ললিতরা ওর মধ্যে নেই।' কুমুদিনী বললেন, 'ছাত্ররা সব ক্ষেপে উঠেছিল সেই মিলিটারীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময়।'

এসব এ যুগের কথা। তাকে দু-হাতে যেন জোর করে ঠেলে দিয়ে রমেশ বলে উঠলো, 'নরেন দাসকে তোমার মনে পড়ে বৌদি?'

অতীতের একটি ছেঁড়া সুতো ধরে টান মেরেছে রমেশ আবার।

কুমুদিনী বললেন, 'তোমাদের দলের সব চেয়ে সেই বাচ্চা ছেলেটি তো? শুনেছিলাম, পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল—তারপর নাকি পাগল হ'য়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।'

রমেশ বললো, 'পুলিসের হাতে পাগলই হয়েছিল বটে কিন্তু ঠিক আত্মহত্যা করেনি। সশস্ত্র আক্রমণের প্ল্যান একটা ছিল আমাদের—সেইটে আদায় করবার জন্যে এমন কোনো অত্যাচার নেই যা পুলিস তার ওপর চালায়নি। ডান হাতের আঙুলগুলো সব ভেঙে দিয়েছিল মট মট করে। তখন ডি-আই বি ছিল সেই কুমড়ো চাটুজ্যে। তার অত্যাচারে পাছে বলে ফেলে—এই জন্যে কূয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিল কোনো রকমে পালিয়ে গিয়ে।'

ছেলেপুলের মা কুমুদিনী—জিবে চুক্ চুক্ ক'রে শব্দ করে ওঠেন। বললেন, 'কি সুন্দর টুক্‌টুকে ছেলেটি ছিল'!—

রমেশ খুশিতে হাসলো। তার প্রসন্ন মুখ নীরবে যেন এই কথাটাই বলে: এই তাদের বিপ্লবী আত্মত্যাগ—তাদের বীরত্ব। সে মুখটা হঠাৎ বড় রূঢ় লাগে কুমুদিনীর কাছে। তিনি চুপ করে থাকেন। রমেশ কথা বলে যায়। নরেন দাস, ভবানী, অনাথ—কত জনের নাম এসে পড়ে। সেই সব নির্ভীক সেরা ছেলেগুলি। কংসাবতীর বুনো চরে, গোপনন্দিনীর পাহাড়ী অন্তরালে দেশোদ্ধারের নিঃশব্দ সে এক আয়োজনের দিনগুলি। সেই সব দিনে, সেই সব পথে, সেই সব মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আজ বিশ বছর পরে সোৎসাহে আর আনন্দে যেন রমেশ ঘুরে বেড়ায়। তার অন্ধ দুই চোখের সামনে সেঁটে আছে একটা ছবি—অমলিন আবেগে মূর্ত। তাদের শৌর্য, তাদের ত্যাগ—

তার প্রতীক স্বয়ং রমেশ দত্ত। কানা দুটো চোখে, বিশ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে আসা প্রৌঢ় আধবুড়ো মুখটা—তার দলের সমগ্র ইতিহাস নিয়ে কুমুদিনীকে সোজা প্রশ্ন করে:

'আছে তেমন ছেলেমেয়ে?—আছে তেমন ত্যাগ নিষ্ঠা?'

কুমুদিনী কেমন ঘাবড়ে যান। কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে বললেন, 'মৃণাল এখন কোথায় কি জানি।'

'তারা আর নেই—কেউ নেই। আমার দল ভেঙে গেছে বৌদি।' রমেশের হঠাৎ এই স্বীকরোক্তিতে কেমন বিষণ্ণতার আমেজ। বললো, 'সবাই কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে—শুনলাম অনেকে মত পথ বদলেছে। বেইমান সব। জেলের ভেতরে থেকে আমি কিন্তু তাদেরই কথা ভাবতুম। ভাবতুম, বেরিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে দল গড়বো।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সে—যেন ধ্যানস্থ। তার পর আবার বলে চললো, 'জেলে থেকে পালাবারও বহু চেষ্টা করেছি। একবার অনেকখানি এগোলামও। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত। খুশি হয়ে জেলের উপহার দিল—বাঁ চোখটা গেল তার কিছুদিন পরেই।'

কুমুদিনী জিবে আবার চুক্ চুক্ শব্দ করে উঠেছেন। বললেন, 'চোখে কি খোঁচা মেরেছিল নাকি?'

'না—খোঁচাটোচা না। আমার চোখের সামনে থেকে বাইরের জগৎটাকে আড়াল করে দেওয়ার দরকার হয়েছিল ওদের।'

দুরন্ত সন্ত্রাশবাদী এক নেতাকে সকলের সঙ্গে সাধারণ শেলে রেখে

জেল কর্তৃপক্ষের স্বস্তি নেই—তার জন্যে ব্যবস্থা হলো পৃথক এক শেলের, গভীর অন্ধকারে।

রমেশ বললো, 'প্রথমটা বড় কষ্ট হত। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেললুম — মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে একটা ছোট ঘুলঘুলি বেয়ে একটু আলো ছিটকে আসছে। কি ভালই যে লাগতো সেটুকু। সেই ছিল আমার সকাল সন্ধ্যের ঘড়ি। তোমাদের বাইরের খোলা মেলা আকাশ আর এত আলো—তার চেয়ে কত ভালো যে লাগতো সেই আলোটুকু। ওয়ার্ডারের সামনে সেদিকে তাকাতুম না—পাছে ধরা পড়ে যাই।'

রমেশ হাসলো। কুমুদিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

রমেশ বলে চললো, 'কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলুম। জেলার এসে অনেক তোড়জোড় করে ঘুলঘুলিটা একেবারে চুনবালি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে গেল। তার ছ-মাস পরে যেদিন বাইরে নিয়ে এলো সেদিন আলোর দিকে আর তাকাতে পারিনি। দু-হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়েছিলাম, কতক্ষণ ছিলাম মনে নেই। তারপর থেকে চোখে জল আসতো অনবরত।'

ওদের নিঃশব্দ আত্মবলির জীবন। কুমুদিনী শুনতে শুনতে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

রমেশ বললো, 'তারও মাস চারেক পরে বোধ করি, দয়া করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তখন বাঁ চোখটায় আর দেখতে পাইনে। ডান চোখটায় জল পড়ছে। অপারেশন করলো—গেল বাঁ চোখটা। তার পর ডান চোখটাতেও ছানি পড়ে গেল। সেটা আর অপারেশন করাইনি।' শেষে হেসে বললো, 'রেখে দিয়েছিলুম ওদেরই জন্যে।

বাইরে বেরিয়ে ভালো করে সারিয়ে তুলে বাঁ চোখটার শোধ তুলবো।'

কুমুদিনী চাপা গলায় অসহ্য ভাবে বলে উঠলেন, 'শোধ তোলো তুমি।'

রমেশ হেসে বললে, 'শোধ তুলবো কি!—আজ সকালে ছাড়া পাওয়ার আগে স্বয়ং জেলার সাহেব শুনিয়ে দিল যে, আজ বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করছে—সেই জন্যেই আমি ছাড়া পাচ্ছি।—স্বাধীন ভারতে!' বিদ্রূপ করে রমেশ বললো, 'জেলার বললে—জেলের বাইরে গিয়ে স্বাধীন দেশের মানুষ আপনি—দেখবেন আপনাদের ত্যাগ বৃথা যায়নি। আরও সব কি কি লম্বা লম্বা বাত্ আওড়ালো। শুনে লজ্জা পেলুম। সেই পুরানো জেলার—ফোকলা দাঁতে কথা বললে। খুব বুড়ো হয়ে গেছে বোধ হয়।'—

রমেশেরও একটা গোটা যৌবন কেটে গেছে জেলের মধ্যে। চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের শাদা নিশান—মনে কিন্তু বিশ্ বছর আগের বিদ্রোহ। ১৪ই অগাস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশের সকাল। জেলের গেট থেকে বাড়ীতে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল ললিত আর বাসনা। কোনো ভিড় ছিল না জেল-গেটে—শহর জুড়ে ১৪৪ ধারার কড়া পুলিসী পাঞ্জা। হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধ কিছুদিন হলো চুপচাপ। আবার একটা অন্ধ উচ্ছ্বাসের উত্তাপ সংগ্রহ করবার জন্যে যেন জিরিয়ে নিচ্ছে। সাধারণ মানুষ শঙ্কায় স্তব্ধ : চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনে একটা চরম মোকাবিলা হয়ে যাবে দুই জাতে।

রমেশ বললো, 'নাঃ, এ রকম একটা দেশ আমরা ছেড়ে যাইনি। একবার ললিত আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিল—আমাদের

অস্ত্র নাকি জনসাধারণের হাতে উঠেছে। সেদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম,' রমেশ বিদ্রূপ করে বললো, 'কিন্তু কথাটা মিছে নয়। আজ বাইরে পা দিয়ে বুঝলাম—বোমা-এসিড, রিভলবার স্টেনগান নিয়ে স্বদেশ উদ্ধারের জন্যে ললিতদের জনসাধারণ পরস্পরকে আক্রমণ করছে।' একটু থেমে রমেশ হেসে আবার বললো, 'আজ আবার ললিত বললো—জনসাধারণ নাকি দাঙ্গা চায় না।—হবে। ওরাই বোঝে। ওদের জনসাধারণ।'

কুমুদিনী চুপ করে বসে রইলেন। রাজনীতির খুঁটিনাটিতে তিনি ঢুকতে চান না। শুধু তিনি এইটুকু বুঝলেন, পুরানো সন্ত্রাশবাদী রমেশ দত্ত বসে আছে তাঁর সামনে। কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে কুমুদিনী সহজ গলায় বললেন, 'বাসনা বলেছিল—তোমার মুখ থেকে গল্প শুনবে। সব কথা হলো কিন্তু সে-ই নেই।'

রমেশ চটে উঠলো, 'গল্প—আমাদের কথা শুধু গল্প! হাত-পা গুটিয়ে আরাম করে বসে শোনবার বস্তু হয়ে গেছে নাকি ওদের কাছে? ওরা কি—এঁ্যা, ওরা কি?'

ঠিক এই সময়েই বাসনা চটি ঘষটে ঘষটে আসছে হুড়মুড় করে। কুমুদিনী আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। রমেশ শুনছে কান খাড়া করে। পরিচিত পায়ের শব্দ। রমেশের মুখটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে: ছুটো ছানি পড়া কানা চোখ, উত্তেজিত ক্ষুব্ধ বলি-রেখা পড়া বুড়োটে মুখ। যেন পুরানো মর্চে ধরা বল্লমের ফলা। বীভৎস।

বাসনা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আবার এ্যাসিড, গুলিটুলি ছুঁড়েছে বৌদি—আমারা মেয়েরা যাচ্ছি সেখানে। ললিত এলে বলে দেবেন। বড়বাজারে।'—

কুমুদিনী শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'সে কি রে—দাঙ্গা বাধলো আবার!'

'প্রায় তাই।' বাসনা যেতে যেতে ঘুরে একটু ম্লান হেসে বলে গেল, 'শান্তিবাহিনী আসছিল—হিন্দুরাই গুলি চালিয়েছে। শান্তিটান্তি ওসব নাকি চলবে না।'

বাসনা চলে গেল।

রমেশের থুত্‌নিটা ঝুলে পড়েছে। বিশ্রী রুক্ষ একটা মুখ। আস্তে আস্তে বললো, 'বাসনা সত্যিই সেখানে গেল—না?' যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রমেশ।

'গেল তো!' কেমন অভিভূত কণ্ঠে কুমুদিনী বললেন।

কিছুক্ষণ বাদে রমেশ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো, আস্তে আস্তে আবার, 'গেল,—না?'

কুমুদিনী শুধু হতাশভাবে বললেন, 'মানুষ ক্ষেপে জানোয়ার হয়ে গেছে একেবারে।'

আর কেউ কোনো কথা বলে না। অতীতের কথা-কাহিনীতে ভরা ঘরের অন্তরঙ্গ উষ্ণ আবহাওয়া হঠাৎ যেন গোরস্তানের অসহ্য এক নীরবতায় ভরে গেছে। সেদিনের আশা আর উত্তেজনা আজ নতুন ক'রে যেন বেঁচে উঠেছিল। তারপর এক ধাক্কায় কি হয়ে গেল! কুমুদিনীর ডানাগুটোনো ঘর-বাঁধা মন শঙ্কিত—সন্ত্রস্ত। তিনি রাস্তার ধারের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখতে লাগলেন। অন্যমনে বললেন:

'রাস্তার লোকজন কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে রমেশ। ছেলে-মেয়েগুলো যে কোথায় বেরিয়ে গেল সব!'—

রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'ইচ্ছে হচ্ছে, আমার সেই বুড়ো জেলারের কাছে আবার ফিরে গিয়ে বলি—আমাদের সব স্বপ্ন সব সাধ শেষ হয়ে গেছে, দয়া করে আবার ভেতরেই নাও।'

বহুক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলে না। জানালার গরাদ ধরে কুমুদিনী তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে। শহরের ধোঁয়াটে আকাশ কালো করে বিকেলের বিষণ্ণ ছায়া ঘন হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

'রাস্তার লোকজন খুব এলোমেলো—না বৌদি?' রমেশ জিজ্ঞেস করলো।

'তাইতো মনে হচ্ছে রমেশ। কোথাও কোথাও জটলাও হয়েছে। ছেলেমেয়েগুলো সব বেরিয়ে গেছে দুপুর থেকে! এ আর পারা যায় না বাপু।' কুমুদিনী অতিষ্ঠ গলায় বললেন, 'এই তো ঘিঞ্জি পাড়া —তার একটি মাত্র ওই ন্যাড়া পার্ক। পার্ক থেকে চার শো হাত তফাতেই মুসলমান মহল্লা। আজ একটা বছর থেকে মেয়েগুলো ঘরে পচে পচে শুকিয়ে গেল।'

রমেশ হঠাৎ একটু খুশির হাসি হেসে বললো, 'রাস্তার লোক ছুটোছুটি করছে না পাগলের মতো?'

'তা করছে না।'

'করবে।' রমেশ বললো, 'উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করবে ওরা—বিশ বছর পরে, দুটো কানা চোখেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বৌদি।'

কুমুদিনী কোনো কথা বলেন না। তিনি যেন ঝুঁকে একাগ্রভাবে কি দেখবার চেষ্টা করছেন। দেখতে পেলেন। বলে উঠলেন, 'আমাদের এই পাড়ার মোড়ে মুসলমান পাড়ার পাশ ঘেঁষে তোরণ

বানাচ্ছে দেখি গোটা কয়েক ছেলে। একটা রক্তারক্তি না হয়ে যায় না!'

'১৪ই অগাস্ট আজ।' রমেশ হালকা গলায় খোঁচা দিয়ে বললো, 'ঠিক রাত বারোটার সময় স্বাধীন হয়ে যাবে দেশ! তারই তোড়জোড় চলছে বোধ করি।'

কুমুদিনী অন্যমনে বললেন, 'কি জানি!'

'বুঝতে পারছো না তুমি?' রমেশ হাসলো। বললো, 'স্বাধীনতা বুঝতে পারছো না!'

কুমুদিনী বুঝতে পারছেন না। বহু দিনের শৃঙ্খল মোচনের কোনো আবেগ, বহু রক্তপাতের পর স্মরণীয় দিনের একটি মহোৎসবের কোনো আনন্দ-উজ্জ্বল চিহ্ন চোখে পড়ছে না তাঁর। মহানগরীর পথে চলমান জনস্রোত—সেখানে আনন্দের কোন চিহ্ন নেই। বরং শঙ্কা। এরই মাঝখানে পাড়ার গুটি কয়েক ছোকরা তোরণ বাঁধছে। সামনের সব কিছু থেকে সেটা যেন অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন নিরুত্তাপ একটা ঘটনা। না, কোনো আনন্দ নেই—কোনো আবেগ নেই। বরং কুমুদিনী একটা গন্ধ পাচ্ছেন যেন ঘন কালো শঙ্কার।

রমেশ জিজ্ঞেস করলো, 'এ পাড়ায় তোরণ বাঁধা হচ্ছে কিন্তু মুসলমান মহল্লায় হচ্ছে কি? দেখতে পাচ্ছ?'

'কিছুটা দেখতে পাচ্ছি।' কুমুদিনী একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তারা কয়েকজন মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।'

'মোড়ে মিলিটারী পিকেট নেই?'

'আছে।'

'তারা ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে না?'

কুমুদিনী চাপা গলায় বললেন, 'ওদের বিশ্বাস নেই। এখুনি লাগিয়ে দিতে পারে। শুনতে পাচ্ছ—কোথায় যেন একটা হল্লা পাকিয়ে উঠছে?'

রমেশ নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠলো।

বহু দূরে কোথায় যেন একটা হল্লা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে—বাতাসে তার অনুরণন। রাস্তার লোকগুলোকে কেমন চনমনে মনে হয় কুমুদিনীর। দূরের মুসলমান মহল্লাটা এতক্ষণ যেন ঝিমিয়ে ছিল। এমনিতেই ওপাশটা জনবিরল—এপাশের লোক পা বাড়ায়নি পুরো একটি বছর। হঠাৎ সেদিকেও যেন একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। দূরের হল্লাটা যেন ক্রমশ জোরে পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশ ভরে তুলছে।

'শুনছো বৌদি?' রমেশ বললো।

কুমুদিনী আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'শুনছি তো!'

হল্লা এগিয়ে আসছে এবার—কুমুদিনীর চারপাশের থম্‌থমে বাতাস মুখর হয়ে উঠছে। একটা মহাকায় যন্ত্র যেন কোথায় কোন বিদ্যুৎ প্রবাহের ছোঁয়া লেগে প্রথমে ধীরে, তারপর বিপুল বেগে তার মহা-ঘর্ঘর জাগিয়ে তুলছে আকাশ বাতাস ভরে।

দু-এক জন করে লোক জমছে—ভিড় বাড়ছে তোরণ বাঁধার কাছে। বিকেলের ম্লান আলো কালো হয়ে আসছে ক্রমশ। সেই অস্পষ্ট আলোয় কুমুদিনী দেখতে পান, মুসলমান পাড়ার মোড়ে হঠাৎ একটা তোড়জোড় তোরণ বাঁধার। তারপর তাঁর আচ্ছন্ন চেতনার ওপর দিয়ে বহু দূরের পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা হল্লাটা উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-বন্যার মতো বয়ে যায়:

এক হো ··· এক হো ···

রমেশ বিচলিত গলায় বলে উঠলো, 'কি হলো বৌদি!'

'বুঝতে পারছিনে রমেশ।' কুমুদিনী আচ্ছন্ন ভাবে বললেন, 'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিনে—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ওপাশের মুসলমান পাড়ায় কোথা থেকে অসংখ্য পতাকা উড়ছে—ওদের পতাকা আর তিন রঙ্গা পতাকা।' কুমুদিনী দম নিয়ে বললেন, 'এপাড়া ওপাড়া হৈ হৈ করে মিশে যাচ্ছে হঠাৎ এক হো—এক হো করে। ওঃ-ই—পুলিসের গাড়ী মোড় থেকে চলে গেল।'

'চলে গেল?'

'হ্যাঁ—চলে গেল। পুবের মোড় থেকেও চলে গেল। মোড়ে ভিড় বাড়ছে।'

'১৪৪ কি উঠে গেল! ব্যাপার কি বলো বৌদি?'

'কি জানি রমেশ!' কুমুদিনী শুধু একই কথা আবার বললেন, 'এপাড়া ওপাড়া মিশে যাচ্ছে হৈ হৈ করে।'

'কেন?'

'কি জানি রমেশ! কি যেন হয়ে গেছে—সব মিলে মিশে যাচ্ছে।'

'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, কিছু বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে রমেশের অবিশ্বাসী কণ্ঠকে খড়কুটোর মতো কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেন দুরন্ত একটা ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপট:

... এক হো ... এক হো ...

কাছে, দূরে—অনেক দূরে শুধু এক নিরবচ্ছিন্ন শব্দ-সমুদ্র। আর কিছু শোনা যায় না, আর কিছু দেখা যায় না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট তরল অন্ধকারে অসংখ্য মানুষ তরল হয়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট অস্থির ভাবে কি একটা যেন রূপ নিচ্ছে।

বিভ্রান্ত রমেশ শুধু বললো, 'ব্যাপার কি বৌদি!'

কুমুদিনী বলে উঠলেন, 'আহা-হা, সেই বুড়ো শালকর আমাদের মোড়ে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রমেশ।'

'কে?'

'এই পাড়ায় দোকান ছিল—বুড়ো মুসলমান শালকর। তিন ছেলে মরেছে এই পাড়ায়। ওমা—ওই ছ্যাখো!' কুমুদিনী বলতে বলতে আঁৎকে উঠলেন, 'দুটি ছোকরা হাতে রিভলভার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মোড়ের দিকে। যেন ক্ষেপে গেছে রমেশ!—'

'হুঁ।' রমেশ মাথা নেড়ে বললো, 'মারলো—না?'

'রিভলবার আকাশের দিকে তুলে সব ফায়ার করে দিল রমেশ।' আবেগে কুমুদিনীর গলা কাঁপছে।

'আকাশের দিকে?—শূন্যে?' রমেশ যেন বুঝতে পারছে না।

'কোথায় ছিল—ওরা কোথায় ছিল এতদিন! কেন এমন ক'রে সব শেষ করে দেয়নি!'

'ওরা আর দাঙ্গা মারামারি চায় না?' রমেশ নিজেকেই শোনালো, 'তাই কি?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না। রমেশ কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিছু বুঝতে পারছে না! একটা দুর্বোধ্য অন্ধকারের ওপর দিয়ে যেন চোখ ঝলসানো একটা জ্যোতির প্রবাহ বয়ে চলে যায়:

··· আজাদ হিন্দুস্থান ··· আজাদ পাকিস্তান ···

'তাই কি? স্বাধীনতা!' এতগুলো লোক ঠকছে? বহুদিনের থিতিয়ে মরা অন্ধ আবেগ কি পথ খুঁজছে ললিতদের সেই জনসাধারণের

বুক ভরা উচ্ছ্বাসের মধ্যে? রমেশ তার দু-চোখের গভীর অন্ধকারে বিভ্রান্তের মতো যেন হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে, 'আমি কিছু বুঝতে পারছিনে বৌদি। বলো—বলো, কি হচ্ছে।'

'মানুষ হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেছে রমেশ।' এইটুকু শুধু বললেন কুমুদিনী আচ্ছন্ন গলায়।

আর কেউ কোনো কথা বলে না। রাত বাড়ছে। কুমুদিনী শুধু দেখেন—সমস্ত কলকাতার মানুষ যেন বেরিয়ে পড়েছে পথে। চোখের আড়ালে, এতগুলি আবেগ উন্মত্ত মানুষের কেমন করে রূপান্তর হলো—জানার আগ্রহ তাঁর নেই। তিনি শুধু দেখছেন। উচ্ছ্বসিত আন্দোলিত এক বর্তমান। রমেশ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে: তার অন্ধকার দুই চোখের সামনে অসংখ্য মানুষের অস্পষ্ট একটা রূপ ভেসে ওঠে। সে শুধু গৃহযুদ্ধের অবসান ঘোষণা নয়, মুক্তির উত্তাল আবেগও নয়। সবগুলো মিশে একাকার হয়ে একটা বিরাট নীহারিকা মণ্ডলীর মতো অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে, অত্যন্ত অস্থির ভাবে তাদের সহস্র সংঘর্ষের মাঝখানেও একটা রূপ নিচ্ছে। সে এক মহাকায় রূপ। সে রূপ রমেশের জেলের এক চিলতে পুরানো আকাশ আবৃত ক'রে, ইট কাঠ পাথর গলি ঘুঁজি ভেঙে মত্ত ঐরাবতের মতো তার অন্ধকার চোখের সামনে এসে যেন দুলছে। ললিতের কথা মনে পড়ে: জনশক্তি। রূপহীন বর্ণহীন অন্ধ এক পুঞ্জিত আবেগ! ললিত!

রমেশ বলে উঠলো, 'ললিত এখনও ফিরলো না।'

কুমুদিনী বললেন 'কোথায় মিশে গেছে আজ এই খ্যাপামীর ভিড়ে।'

'কটা বাজলো বৌদি?'

'১১টা। ওই ছ্যাখো—কি বিরাট এক মিছিল হিন্দু-মুসলমানের !'—

'হিন্দু-মুসলমানের—না ?' কানা রমেশ নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে যেন জিজ্ঞেস করলো, 'খুব বড় মিছিল—না ?'

একটি মিছিল এসে দাঁড়ালো গলির মুখে।

··· এক হো ··· এক হো ···

কুমুদিনী জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলে উঠলেন, 'ওমা, মিছিল যে আমাদেরই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো রমেশ! তাইতো, কাকে ওরা যেন কাঁধে করে নিয়ে এসেছে !'

নিয়ে এসেছে ললিতকে।

কুমুদিনীর আচ্ছন্ন চেতনায় সবটা বোধগম্য হওয়ার আগে কয়েকটি যুবক ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর একটি অসংখ্য ফুলে ঢাকা খাটিয়া। রাশি রাশি ফুলের মাঝখান থেকে শুধু ললিতের মুখটুকু দেখা যাচ্ছে—যেন ঘুমোচ্ছে।

একটি ছেলে বললো, 'বড়বাজারে ওঁকে গুলি করে। শান্তি শোভাযাত্রার আগে আগে ছিলেন।' একটু দম নিয়ে ছেলেটি বললো, 'সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাই। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই মারা যান। ঠিকানা জানিনে—সময় মতো খবর দিতে পারিনি। মরবার আগে একবার মাত্র জ্ঞান ফিরে আসে—তখনই সব জানতে পারি। তারপর আমরা মিছিল করে বেরিয়েছি।—'

রমেশ কান খাড়া করে শুনছে। সারা ঘর নিস্তব্ধ। বাইরে মহানগরীর অন্ধকার আকাশ ভরে কাছে আর দূরে নিরবচ্ছিন্ন গর্জন : এক হো ··· এক হো। ···

আর, একজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে দ্রুত—সেই চেনা

শব্দ রমেশের—সেই হুড়মুড়ে, চঞ্চল, সংকোচহীন। দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলছে :

'বৌদি—ললিত ফেরেনি এখনও! বৌদি!—'

ঘরের সামনে থমকে দাঁড়ালো সে। এগিয়ে এলো ধীর পায়ে—নিঃশব্দে, সকৌতূহলে। তারপর সে ঘরের মহানীরব এক দানব যেন গিলে ফেললো তাকেও। সবাই চুপ করে গেছে।

একটি ছেলে নীরবতা ভেঙে বলে উঠলো, 'উনি নার্সকে নাকি বলেছিলেন, ওঁর দাদা রমেশ দত্তের কাছে যেন একবার নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নাকি আজ ছাড়া পেয়েছেন—পুরানো অগ্নিযুগের বিপ্লবী। আর—আর ওঁর হাতে একটা আংটি ছিল। বাসনা বলে কাকে ফিরিয়ে দিতে বলে গেছেন।'

বলতে বলতে ছেলেটি আংটিটা খোলবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো খাটিয়ার ওপরে।

হঠাৎ একটা বাঘিনী যেন পেছন থেকে আর্তনাদ করে ওঠে সুগভীর একটা খোঁচা খেয়ে :

'না না—না।'—

বাসনা। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে—টলে পড়ছে। কুমুদিনী ধরে ফেললেন।

ঘরের মধ্যে নেমে এলো আবার সেই মহানীরব গুমোট। তার মাঝখানে শুধু অবরুদ্ধ একটা ফোঁপানী শোনা যায়। উচ্ছ্বসিত একটা কান্নার সমুদ্র যেন ফুলে ফুলে উঠছে।

রমেশ এগিয়ে গেছে মৃতদেহের পাশে। হাতড়ে হাতড়ে দেখছে—হাত বুলোচ্ছে ললিতের মুখে চোখে নাকে কপালে। একটা

তরুণ তাজা মুখ—অতি সাধারণ একটা মুখ: গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ললিতের মুখটা মনে করতে পারছে না সে—বিশ বছর আগের একেবারে কচিমুখ একটা। তারপর অনেক বড় হয়েছে সে।—এ যুগে। শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে বহুদিন আগের সেই নরেন দাসের মুখটা।—যেটাকে বড় ভালোবাসতো। দুটো মুখ তালগোল পাকিয়ে যায়। একাকার হয়ে যায়।

এলোমেলো কম্পিত হাতে ললিতের মুখে হাত বুলোতে বুলোতে রমেশ বিড় বিড় করে বললো, 'ললিত!—ললিত বলে গেছে ··· তার দাদার কাছে!'···

গলাটা একটু যেন কেঁপে ওঠে রমেশের।

গলির মোড়ে মিছিল অপেক্ষা করে আছে। ললিতের মৃতদেহ নিয়ে সারা রাত ওরা ঘুরবে শহরের পথে পথে। ফুলে ঢাকা খাটিয়াটা আবার বেরিয়ে এলো এক সময়ে বাইরে—দাঁড়ালো গিয়ে মিছিলের সামনে।

অজগরের মতো মিছিল চললো আবার, পেছনে পড়ে রইলো একটা বাজপড়া ঘর।

রমেশ জিজ্ঞেস করলো, 'বৌদি—বাসনা?'

'দাঁড়িয়ে আছে। দরোজার কাছে।'

'কাঁদছে—না?'

কুমুদিনী জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলেন—বললেন, 'না—চোখ মুছে ফেললো।'

'মুছে ফেললো—না?' রমেশ আস্তে আস্তে আবার যেন নিজেকেই শোনালো, 'চোখ মুছে ফেললো।' তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'মৃণালও মুছে ফেলতো।'

তার পর আবার সব চুপচাপ।

হঠাৎ বাইরে থেকে নিরবচ্ছিন্ন শঙ্খরোল ভেসে আসে। রমেশের দু-চোখের অন্ধকারে আবেগে ফেটে পড়ে কোটি কণ্ঠের কলরোল সমুদ্র গর্জনের মতো। বুক ফাটানো অন্ধ উচ্ছ্বাসের মহাপিণ্ড একটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে যেন রোলারের মতো এপাড়া ওপাড়ার সীমান্ত ভেঙে, জাতি-বিদ্বেষের সমস্ত রক্তাক্ত ইতিহাস মাড়িয়ে তার অপ্রতিরোধ্য গুরুভার গতিতে। পাহাড়-ঠেলা জনতা।

রমেশ বললো, 'বারোটা বাজলো—না?'

'হুঁ!' কুমুদিনীর গলা কাঁপছে।

'তুমি কাঁদছো বৌদি?'

'না।'

কুমুদিনী চোখ মুছলেন। তবু তিনি কাঁপছেন। কান্না চাপছেন। বাইরে নিরবচ্ছিন্ন শঙ্খরোল আর দূরান্তব্যাপী গর্জন—জয়ধ্বনি: আজাদ হিন্দুস্থান—আজাদ পাকিস্তান।—এর মাঝখানে প্রাণপণে কান্না চাপছেন কুমুদিনী। একটা দুরন্ত শিশু যেন তাঁর সামনে হঠাৎ ঠেলে এসে দাঁড়ায় আজকের উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি মাড়িয়ে—রোগা শীর্ণ মুখ, তরুণ মুখে প্রাজ্ঞতার গাম্ভীর্য—যাকে তিনি লালন করেছেন, পালন করেছেন। ছেলেপুলের মা কুমুদিনী—তিনি নীরবে শুধু ফুলে ফুলে উঠছেন অসহ্য চাপা একটা যন্ত্রণায়।

সে যন্ত্রণার চাপা অব্যক্ত শব্দ শুনতে পায় রমেশ নিজের বুকের মধ্যেও। চুপ করে সে বসে রইলো পাথরের মূর্তির মতো। সকালে জেল-গেটে ললিতের কথা মনে পড়ে তার।

ললিত বলেছিল, 'আজ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিং এ আপনাকে যেতে হবে দাদা।'

রমেশ উত্তর দিয়েছিল, 'না।'

'আমি যে কথা দিয়েছি! পুরানো বিপ্লবীদের সবাই দেখতে চায় আজ তাদের সামনে। আমাদের মিটিং-এ আপনাকে যেতেই হবে।'

'না।' অস্বীকারে সমস্তটাকে যেন ক্রোধে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রমেশ।

একটা আফশোস আর চাপা যন্ত্রণার আভাস ফুটে ওঠে রমেশের মুখে। শুধু বললো, 'জান বৌদি—সে আজ সকালে বলেছিল আমাকে'—

কথা শেষ করতে পারে না রমেশ। শেষ করতে যেন কষ্ট হয়। ললিত নেই—তার ভাই!—এযুগ!—

বাইরের গর্জিত জনতা তার দু-চোখের অন্ধকারকে মুখর ক'রে তুলছে দমকে দমকে নির্মম ভাবে।

আবার সেই বহুদিন আগের ছবি আঁকা।

অমিয়ার মাথার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসি। কি যে বলবো—প্রথমটায় খুঁজে পাইনে। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। তবু কিছু বলতে হবে। ডাক্তারের কাঁকর-চিবনো দরদী উপদেশগুলি মনে পড়ে। ডাক্তার বলেছিল, 'আপনিই যাবেন মাঝে মাঝে। বোঝেনই তো—আপনি গেলে উনি সবচেয়ে খুশি হবেন। হাসপাতালে গিয়ে ওঁর ধারণা হয়েছে—আর বাঁচবেন না।'

কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল। সপ্তাহ দুই হল প্রায়, অমিয়া এসেছে এখানে। তাকে আমার খুশি রাখতে হবে। বলতে হবে—তুমি বাঁচবে অমিয়া: যখন জানি—সে হয়তো বাঁচবে না। তবু ছবি আঁকতে হবে আমার—জীবনের অনাগত পরম দিনগুলির। আমি জানি—বোকা অমিয়া কিসে খুশি হয়। আমি জানি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তার বিহ্বল দুর্বলতার ইতিহাস।

কিন্তু কেমন ক'রে যে শুরু করি ভেবে পাইনে। তারপর ফস্ ক'রে মুখে যা আসে তাই বলে বসি:

'তোমাদের হাসপাতালটি বড় চমৎকার অমিয়া। সামনের ওই ঘাসে-ভরা লনটুকু—আহা!'

কথা আর শেষ হলো না। অমিয়া যেন ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে উঠলো, 'হুঁ, খুব ভালো। উঠোনময় ঘাস এক গলা ক'রে—মাঝে মাঝে সাপ এসে ঢোকে ওয়ার্ডের মধ্যে।'

দমে গেলাম। এবার ছুটলাম লন ছেড়ে বাইরে। বললাম, 'বাইরেটা দেখেছ কখনও? যখন বাইরে গিয়ে বসতে দেবে—তখন তাকিয়ে দেখো একবার, ঘাসবনের কি রূপ! তোমাদের হাসপাতালের দক্ষিণ-পূর্ব ঘিরে মস্ত একটা ঝিলের মতো আছে—দূর থেকে সবটাকে মনে হয় দ্বীপের মতো। সবটা এতো চমৎকার!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

আমার আবেগ দেখেই অমিয়া বোধ করি একটু হেসে বললো, 'ঝিলের কথা শুনেছি—মশার ডিপো। মার্কিন সৈন্য যখন ছিল তখন নাকি পিপে পিপে কেরোসিন ঢালতো মশা মারার জন্যে। আর এখন'—ব'লে ঠোঁট উল্টলো অমিয়া। বললো, 'এর ওপরে একবার ম্যালেরিয়া ধরলেই—বাস্‌।'

সুর কেটে যাচ্ছে বারে বারে।

তবু সোৎসাহে বললাম, 'রুজভেল্ট টাউনের কথা শুনেছ?'

'সেটা কি?'

পেয়েছি এবার। উচ্ছ্বসিত হয়ে থৈ থৈ করে বললাম, 'আহা! যাই বলো—আমেরিকানদের চোখ ছিল—দিব্যি জায়গাটি বেছে নিয়েছিল আমবাগানের ছায়ার মধ্যে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় বাংলোর মতো কি সুন্দর সব ছোট ছোট বাংলো অমি—যেন আশ্রম। সে যদি দেখ

তুমি—ভালো লাগবে তোমার, থেকে যেতে ইচ্ছে করবে তার যে কোন একটায়।'

যুদ্ধের সময় বিরাট অঞ্চল জুড়ে মার্কিন ফৌজের ব্যারাক হিসেবে গড়ে উঠেছিল রুজভেল্ট টাউন। বাংলো প্যাটার্নের ছোট ছোট ব্যারাক—কোনটা খড়ের চালা, বেশীর ভাগই টালি। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ প'ড়ো ভিটের ভাঙা মাটির দেওয়াল; সেনাশিবির সৃষ্টির প্রয়োজনে উদ্বাস্তু গ্রামের মানুষের অবশেষ চিহ্ন। শিবির এখন শূন্য। কাঁটা তারের খুঁটি আর ব্যারাকের দেওয়াল হেলে পড়েছে। উলুবন আর আমবাগানের মধ্যে ধূ ধূ করছে বিরাট এক জনমানবশূন্য এলাকা। তারই একটা বিস্ময়কর ছবি তুলে ধরি অমিয়ার সামনে। আমি জানি বাইরের অজ্ঞাত পৃথিবীর জন্যে অমিয়ার দুরন্ত লোভ আর রহস্যময়তা।

বললাম, 'এখান থেকে যাওয়ার দিন সবটা তোমায় ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাবো।'

অমিয়ার চোখ কি যেন ভাবছে—দেখছে। হয়তো বাইরের সেই জগত—যেখানে আবার সুস্থ মানুষের মতো ঘুরে বেড়াবে সে। খুশি হই।

কিন্তু অমিয়া বিষণ্ণ-ক্লান্ত কণ্ঠে বললো, 'আমার আর যাওয়া!'—

তবু বলি, 'সেরে তুমি উঠবেই অমি। এবার কলকাতার সেই কানা গলিতে তোমাকে নিয়ে আর ফিরছি না। নৈহাটির গঙ্গার ধার ঘেঁষে একটি বাসা দেখলুম আজ—ভারি চমৎকার!'

অমিয়ার চোখে জিজ্ঞাসা।

সোৎসাহে বললাম, 'ওই গঙ্গার ধারের দিকে খান দুয়েক ঘর নিয়ে বাংলো। আমি ভাবছি—এখন থেকেই নিয়ে রাখি। তুমি এখান থেকে বার হলে পর ওইখানে গিয়ে উঠবো একেবারে।'

অমিয়া চুপ।

যেন প্রাণপণে বললাম, 'বাংলোর পিছনের দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কম্পাউণ্ড—একেবারে গঙ্গার ধার পর্যন্ত। বেশ থাকবো সেখানে। তোমার ভাল লাগবে অমি।'

এতক্ষণে অমিয়া কথা কইলো। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু বললো, 'ওসব কথা আজ আর বলে কি লাভ!'—

কোন লাভ নেই! এতদিন পরে, এত ঘটনার পরে—কোন লাভ নেই আর। জানি। শুধু মনে হয়—ধরা পড়ে গেছি। এবার পালাতে পারলে বাঁচি। কেমন একটা অসহ্য গুমোট।

স্টেশনে ফেরার পথটুকু বড় ক্লান্ত মনে হয়।

আবার সেই কলকাতা। কানা গলি। ক্যাবিনেট বাক্সের মতো একখানি ঘর। রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর—আজ আমি এতদিন পরে হেরে গেলাম বোকা অমিয়ার কাছে। কত ছবিই আঁকলাম বসে বসে!—

পেছন থেকে কাঁধে কে হাত রাখলো। ডাকলো, 'নরেন!'

'আরে নন্দ! এখানে? ঝোলাঝুলি নিয়ে?'

'কিছু করতে হবে তো। নইলে খাব কি? তাই'—

'মানে? ঝোলায় কি?

'আমেরিকা।' হাসলো নন্দ। বললো, 'চকোলেট আছে, লজেন্স, ছুরি, ফিতে। যাক সে কথা। তুমি কি করছো?'

কি করছি! অমিয়াকে সুন্দর সুন্দর কথা বলে এলাম আর কি! বিশ্রী লাগছে। লোকটা মনে পড়িয়ে দিলে—ছাঁটাই সরকারী কর্মচারী আমিও। নন্দও। বেকার। কিছু করতে হবে। তারই মতো। ম্লান মুখে শুধু একটু হাসলাম।

নন্দ বললো, 'চলি ভাই—ট্রেন ছাড়লো'—

ট্রেন ছাড়লো।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি বাইরের দিকে। হু হু করে ট্রেন ছুটেছে—ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে কাঁচড়াপাড়া। অমিয়া রয়ে গেল। রেল লাইনের কোল থেকে দূরে দূরান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ফাঁকা মাঠের দেশ পাল্লা দিয়ে ছুটেছে ট্রেনের সঙ্গে। বিকালের বিষণ্ণ আলোয়-মাখা আকাশ আর পৃথিবী—আমার আগামী দিনের মতো, ধীরে ধীরে ঘোর হয়ে আসছে। আত্মহারা—এত বড় বিশ্বজগৎ! কতদিন পরে যে কলকাতা ছেড়েছি! দশ বছর? উঁহুঁ—তারও বেশী। পৃথিবীটা যে এত বড়—এ যেন মনেই ছিল না এতদিন। তবু তা ঘোর হয়ে আসছে। অমিয়ার মুখটা মনে পড়ে যায়—ওই রকম বিষণ্ণ আর সুদূর বিকেলের দিগন্তের মতো, মহাশূন্যের মতো। ওই বিষণ্ণ শূন্যতা কি জীবন! আঃ, কোথায় যেন একটা মিল আছে। মিল আছে। মনে ভাবি, সঙ্গে আজ অমিয়া থাকতো যদি—পাশ ঘেঁসে বসতো এই রকম জানালার কাছে! জীবনের বহু প্রত্যাশিত একটি বিকেল কি অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠতো! কোথাও বাইরে যাওয়ার কথা শুনলে অমিয়ার চোখ দুটোতে যেন স্বপ্নের ঘোর লাগতো। কেমন এক রকম বোকা বোকা ভাবে চেয়ে থাকতো মুখের দিকে। বাইরে বিকেলের বিষণ্ণ জগৎটার দিকে তাকিয়ে সেই মুখটাকেই মনে পড়ে বারে বারে।

বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই হবে বোধ করি। একটা ব্যাপার ঘটে গেল। অমিয়া তার বাপের বাড়ীর এক কানা গলি থেকে এসে ঢুকেছে আর এক কানা গলিতে। আমার ঘরে। মা তার কাছে অবসর সময়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে গল্প করতো জাঁকিয়ে। সগৌরবে

বলতো নিজের বাপের বাড়ীর কথা—শ্বশুরের ভিটের কথা। দুঃখ ক'রে বলতো:

'এখানে এই দম আটকে মরা আর চিংড়িদহে সব হা-হা করছে। শ্বশুরের ভিটে, ঘর-দোর, বাগান, পুকুর। আহা, ঘরের সামনে সেই কামরাঙা গাছটি!'—

অমিয়া হাঁ করে চেয়ে থাকতো মায়ের মুখের দিকে। বুঝতাম, কোনো গলির কোনো ভাড়াটে বাড়ীতে আজন্ম প্রতিপালিত এই আঠারো বছরের মেয়েটির চোখে দেশের বাড়ীর খোলামেলা দোর-দালান আর পুকুর-বাগানের এক স্বপ্নের ঘোর লেগেছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও সে সেই সব কথা তুলতো—আবার নতুন করে যেন আমার মুখ থেকে সে শুনতে চাইতো সবটা। বলতো:

'আমাকে নিয়ে যাবে একবার চিংড়িদহে?'

'যাবো।'

কিছুক্ষণ সে চুপ করে কি ভাবতো। তারপর বলতো, 'আচ্ছা, পুকুরে মাছ আছে?'

সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবে পুকুর থাকলে তাতে মাছ থাকবে না—এ কেমন কথা! গম্ভীর হয়ে জবাব দিতাম, 'তা আছে—একমুনি দেড়মুনি মাছ সব আছে।'

'আর বাগান? কি কি গাছ আছে?'

অমিয়ার যেন নেশা ধরেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বহুবার শোনা কথাগুলো শুনতে তার ক্লান্তি নেই। আমারও যেন লোভ হত বলতে। বলতাম, মার চেয়ে ভালই বলতাম। অমিয়া বুকের কাছ ঘেঁষে চুপ করে শুনতো।

'একটা সোঁতা আছে—পাহাড়ী ঝোরার মতো। আমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়।'

'কই, তোমার মার মুখে তো শুনিনি কোনো দিন!'

'মা দেখেনি। শুনেছি কোন মাঠের মধ্যে থেকে নাকি ঝোরাটা উঠেছে।'

'মাঠের মধ্যে থেকে!'

'হুঁ। আধ-পাহাড়ী জায়গা তো!'—

আশ্চর্য! তিনতলা এক বাড়ীর নীচের তলায় ক্যাবিনেট বাক্সের মতো দম-আটকানো একখানি ঘর। আমার একান্ত ঘন সান্নিধ্যে অমিয়া। চিংড়িদহের মাঠ আর আকাশ সেখানে যেন ডানা মেলে উড়তো। আমার দেখা ছেলেবেলায় শুধু একবার—ঠাকুরদা'র মরার সময়। তবু সবটা এত পরিচিত মনে হত সেদিন চিংড়িদহকে। কেরানীর কর্মক্লান্ত জীবনে সে যেন ছিল দেশভ্রমণ।

অমিয়া অসহ্য গলায় বলতো, 'যেতে ইচ্ছে করে না তোমার? কী তুমি!'

'ভয়ানক ইচ্ছে করে।' আমি আদর করে বলতাম, 'ইচ্ছে করে, তোমাকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে থাকি কিছুদিন। শুধু তুমি আর আমি। ছেলেবেলায় দেখা—তবু সেই কি যেন একটা ঝোপের কাছে সোঁতার বাঁকটা, তোমাকে রোজ নিয়ে গিয়ে বিকেলে বসতুম সেখানে। তোমারও ভালো লাগতো।'

অমিয়া আবেগে অধীর আগ্রহে বলতো, 'নিয়ে চলো আমাকে একবার।'

বলতাম; 'ঠিক বিশ বছর চাকরী করবো। তারপর চলে যাবো

তোমাকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে। তখন শুধু ছুটি—আর ছুটি। ছেলেমেয়েরা তখন বড় হয়ে উঠবে।—'

'ধ্যাৎ।'

অমিয়া কুঁকড়ে বুকের মধ্যে মুখ লুকাতো।

যুদ্ধের দৌলতে তখন নতুন চাকরী পেয়েছি। আর স্ত্রী হলো অমিয়ার মতো একটি নিরীহ ভালোমানুষ মেয়ে! আর চিংড়িদহের স্বপ্ন। ···

অমিয়া ক্ষেপে উঠলো শেষ পর্যন্ত। চিংড়িদহে সে একবার যাবেই। সামনে তখন আমার ছুটি ছিল দিন দশেকের। যাওয়ার যত জল্পনা-কল্পনা হত তার আমার সঙ্গেই। আমি সোৎসাহে নানান কথা বলতাম আর এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু আর এভাবে চললো না। অমিয়া মাকে গিয়ে ধরে পড়লো :

'কদিন ছুটি আছে—আপনিও চলুন চিংড়িদহে।'

মা বলেছিলেন, 'আ আমার কপাল! সে সব কি আর আছে? কত্তার শেষ অসুখের সময় ভিটে শুদ্ধু সব বন্ধক দিতে হলো। সে আর নরেন খালাস করলো কই! নিলেম হয়ে গেল।' শেষে মা আফশোস করে বলেছিলেন, 'আহা! ঘরের সামনে কি সুন্দর কামরাঙা গাছটি ছিল!'

অমিয়া চটে আমাকে এসে বলেছিল, 'তোমাদের যত সব ধাপ্পা।'

ধাপ্পা! ইচ্ছে নয়—আশা নয়।

কয়েকটা দিন ঠোঁট ফুলিয়েই ছিল অমিয়া। মায়ের রহস্য আর ফাঁস করিনি তার কাছে: মা কোনোদিনই দেখেননি তাঁর শ্বশুরের

ভিটে—শুনেছেন বাবার কাছ থেকে। আর ঘরের সামনের সেই কামরাঙা গাছটি—আহা কি জানি, কামরাঙা গাছ কেমন!

চিংড়িদহের কথা ওইখানে শেষ হয়ে গেলেও তবু তুলেছি বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা। পাহাড়, সমুদ্র, খোলামেলা আকাশ আর পৃথিবী। সেগুলি ছিল যেন আমার ছেলেভুলানো খেলনা। শুনে আবার অমিয়ার তুই চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। হিসেব করতে বসেছি দু-জনে—অল্প খরচে কোথায় যাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত অমিয়াই সলজ্জে বলতো, 'ও থাক এখন—টানাটানি চলছে। এবার মাসে মাসে কিছু কিছু করে জমাবো।' আফশোস করে বলতো, 'আহা, চিংড়িদহের সব যদি থাকতো!'—

মনে আছে, দার্শনিকতা করে জবাব দিতাম, 'থাকতে পারে না যে অমি। আগের পুরুষের সঙ্গে একটা যুগ শেষ হয়ে গেছে। এ আমাদের ঝড়ে-পড়া দিন। সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।'

আমাদের ঝড়ে-পড়া দিন। ঝড়ে-পড়া জীবন। ঝড়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি—রেল লাইনের পাশে ফাঁকা মাঠে গত মহাযুদ্ধের অবশেষ চিহ্ন। ভাঙা এরোপ্লেনের ডানা, মিলিটারী ঘাঁটি আর ফৌজী রেশনের স্তূপাকার খালি বাক্স। ছড়িয়ে ছত্রখান। আমাদের জীবন।

ট্রেন থেমেছে কোন স্টেশনে যেন। হঠাৎ একটা সোরগোল পাকিয়ে উঠছে। চোখ ফিরিয়ে দেখি—একপাল ছেলে উঠলো গাড়ীতে। দশ থেকে পনেরো বয়স। কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো, ইস্কুলে যাওয়ার মতো। আমাদের কামরায় ঠেলে উঠলো জনা তিনেক। কোন রেলওয়ে ইস্কুলের ছাত্র হয়তো।

না, ক্যানভাসার।

'মাটির দাম—আমেরিকান চিরুনী, টুপি, মোজা, মজবুত জুতো।'—

'আমেরিকান লেবেঞ্চুস—চকোলেট, বিস্কুট, খেলে পরে তেষ্টা নেই।'—

'সিগারেট। সস্তা আমেরিকান।'—

আমেরিকা! আমেরিকা! বাজারে উজাড় করে দিয়েছে মাল। একটা যুদ্ধের শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর পঙ্গপালের মতো ওই কচি কচি ছেলেগুলো বেরিয়ে পড়েছে ওই বয়সে ছুনিয়ার ইস্কুলে—কাঁধে ব্যাগ, ব্যাগে আমেরিকা। ওয়ার বেবিজ—মহাযুদ্ধের শিশু। ওদের যুদ্ধ সবে শুরু। ঝড়ে পড়া দিন শুধু আমাদেরই নয়। নন্দকে মনে পড়ে যায়। ছাটাই।

মনে পড়ে প্রীতির কথা। প্রীতিরা কি করবে? প্রীতি জন্মেছে যুদ্ধের শেষাশেষি। মেয়ে হওয়ায় অমিয়া খুশি হয়নি খুব।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি নাম রাখবে অমি?'

'লক্ষী প্যাঁচা। রাক্ষসী। সারাটা রাত শুধু ছুধ খাওয়ার জন্ম চেঁচাবে।'

বড় অন্যায়। অমিয়ার রাগ দেখে হাসতে গিয়ে থেমে গেছি। বুকে ছুধ নেই অমিয়ার। কেরানীর বৌয়ের শুকনো বুক। লাবণ্যভরা গাল ছুটো কেমন বসে গিয়েছে, ঠোঁটের পাশ ছুটো কেমন ক্ষয়ে যাওয়া—সুডৌল পাছাটা ভেঙে এখন তিন কোণা দেখায়।

তবু কেটে গেছে দিন গা-সওয়া কৃত্রিম এক উষ্ণতায়।

আবার একটা সোরগোল। গাড়ী থামলো কোন স্টেশনে। কাঁকিনাড়া। ঘন ঘন স্টেশন এ লাইনে। শিল্প-কারখানা কেন্দ্র ক'রে

ছোট ছোট নোংরা শহর, স্টেশন। যাত্রীর ওঠানামা চেঁচামেচি। মজুর, ব্যবসায়ী, ভদ্রলোক, ফড়ে। ক্লান্ত চোখে তাকাই প্লাটফর্মের দিকে। প্লাটফর্ম ভরে গেছে মজুরে। সেখানে কেমন একটা উত্তেজনা—ধস্তা-ধস্তি। ধস্তাধস্তিটা এগিয়ে আসছে আমাদের কামরার দিকে। উঠলো আমাদেরই কামরায়। একটি লোককে জবরদস্ত তুলে দিয়ে ঘিরে বসলো চার-পাঁচ জন মজুর। লোকটা বুড়োমত—মাথায় তার একটা ময়লা কাপড় জড়ানো। দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠলো সেটা। রক্তের ধারা চুইয়ে আসছে তোবড়া গালের ওপরে। বুড়ো ফুঁসে উঠছে থেকে থেকে :

'ছোড় দো—যানে দো হামকো। উয়ো কুত্তিকা বাচ্চা মালিক্‌কো সাথ আজ সওয়াল করেঙ্গে হাম।'

একটা বোঝাপড়া করে নেবে সে। ক্ষ্যাপা সিংহের মতো কেশর ঝাড়া দিচ্ছে যেন। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে অবরুদ্ধ আক্রোশে। যারা ঘিরে বসেছে তারা ভয় দেখাচ্ছে—বোঝাচ্ছে : এখুনি পুলিস এলো বলে।—গুলি চলবে। আর ধর্মঘট তো হয়ে গেছেই। এখন খামাখা হামলা করলে গুলি চলতে পারে।

চলুক। বুড়ো আবার ঝাঁজিয়ে উঠলো, 'আরে—কাম করো, কাম করো—আউর ভুখমে মর যাও! বাৎ মৎ করো। শ্‌শালা—দেখ্‌ উধার—মজুরকা ইজ্জৎ, জরুবেটিকা হাল। দেখো বাবুজী। দেখো।'—

একাগ্রদৃষ্টিতে বুড়োর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ডাক দিয়ে বুড়ো তর্জনীর ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে একদিকে। কামরার সবাই তাকায়। ট্রেন চলেছে একটা কুলি-লাইনের পাশ দিয়ে। চেয়ে দেখি, একটা নীচু

পাঁচিলের ওপরে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে গুটি কয়েক কালো কালো মেয়ে —রোগা রোগা। মুখে রঙ পাউডার মাখা, পরনে সস্তা ছাপা সাড়ী। বুড়ো উত্তেজিত ভাবে দাঁতে দাঁত চেপে বলে—'ওরা সারা দিন গতর খাটায় কারখানায়। পেট ভরে না—রাতে বেচে ইজ্জৎ।'

'শ্‌শালা—মর যাও।' কপাল থেকে ঘাম মোছার মতো রক্তের ফোঁটাগুলি মুছে নিয়ে নোংরা দাঁতে কথাগুলো চেপে চেপে বললো, 'বদলা লেনে শেকোগে ?'

'লেঙ্গে একরোজ।'

একদিন। নেবে একদিন। অবলীলা ক্রমে বলে গেলো। তাকাই ওদের মুখের দিকে : গম্ভীর নোংরা, চিন্তাকুটিল। মাথায় ভিড় করে আসে আমার প্রিয় মুখগুলি : অমিয়া—প্রীতি। ছাটাই। নন্দ।—

এবার নন্দ এসেছে আমাদের কামরায়। গাড়ী আবার কোন স্টেশনে থেমেছে যেন। নন্দর ভূমিকাটি ভালো। বি. এ. পাশ নন্দ।

'চাকরী খুইয়ে এসেছি দাদা পেটের জ্বালায়। নিন ছেলেমেয়েদের জন্যে লেবেঞ্চুস বিস্কুট চকোলেট। গেঞ্জি মোজা টুপি। সস্তা টেকসই আমেরিকান মাল। আছে মজবুত জুতো। আছে দাদা টেকসই আমেরিকান মাল। যা দরকার চেয়ে নেবেন দাদা।'—

'ল্যাঙট হ্যায় ?'

'আওরাৎ ?'—

নোংরা দাঁত বের করে হাসছে মজুর কট্টি।

ওপাশে বুড়োমতো অন্ধ ভিখিরী একটি গান ধরে দিয়েছে :

স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়। ...

বহুদিনের পুরানো গান। নন্দর প্রাণপণ চিৎকার। কামরায়

বহুকণ্ঠের মিলিত গুঞ্জন। সর্বস্বান্ত শরণার্থীর মারখাওয়া মুখের ভীড়, উৎখাত মানুষ, ভিখিরী, বেশ্যা, মজুর আর ভদ্রলোক—মেয়ে আর মরদে ঠাসা। টুকরো টুকরো কথা—ক্ষোভ, দীর্ঘশ্বাস আর অভি-সম্পাতের তালগোল পাকানো পিণ্ড। চাপা চাপা। ঠাসাঠাসি। ঘামে ভেজা। নোংরা। ট্রেন ছুটেছে তীব্র গতিতে। যন্ত্র আর লোহার চাকার নিরবচ্ছিন্ন তাল। অমিয়া। আমার স্বপ্নভ্রষ্ট জীবন। তাকাই সেই বুড়ো মজুরটির মুখের দিকে—থম্‌থমে ভয়ঙ্কর, রক্তজমাট। 'বদলা লেনে শেকোগে?'—কথাগুলো যেন জমাট বেঁধে গেছে তার মুখে। ভয়ঙ্কর। রক্তজমাট।

কলকাতায় ট্রেন এসে পৌঁছলো রাত আটটা নাগাদ।

কামরায় ঠেলে উঠলো মিলিটারী পুলিস। ঘিরে ধরলো মজুর কটিকে। প্লাটফর্মের ঠাসা ভিড়ের মাঝখানে হঠাৎ শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। বেয়নেট-লাঠি চার্জ আর রদ্দা—চাপা গোঙানী আর কোল থেকে ছিটকে যাওয়া ভয় পাওয়া কচি ছেলের চেঁচানী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই থিতিয়ে আসে সবটা। প্লাটফর্ম খালি হয়ে যায়। মজুর কটিকে আর দেখা যায় না। অপেক্ষমান ওৎপাতা অন্ধকার প্রিজন ভ্যানটা হুস্ করে বেরিয়ে যায় স্টেশন ইয়ার্ড থেকে। শুধু দূরে—হাওয়ায়—আলোয়—অন্ধকারে কোথায় যেন ফেটে পড়ে ক'টা নিষ্ঠুর গলা:

ভুলো মৎ—ভুলো মৎ....

আমার স্বপ্নভ্রষ্ট জীবন—অমিয়া! চিংড়িদহ!—স্টেশন ইয়ার্ডের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াই ছোটখাট একটি ভিড়ের পিছনে। সামনের লোকগুলির কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিড়ের পেছনের লোকগুলি

কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে। গলা বাড়াই আমও। চোখে ঝলক দেয় সেদিনের সংবাদ পত্রের বড় বড় হরফের সারা পৃষ্ঠাব্যাপী হেড লাইন :

চাই একনিষ্ঠা সেবা, ত্যাগ, উৎপাদন বৃদ্ধি—

কোনো নেতার বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত। তার নীচে লাল কালিতে মোটা মোটা হরফে হাতে লেখা :

ধাপ্পা! আগে চাই বাঁচার অধিকার।

বাঁচার অধিকার!—পেছনে ভিড় বাড়ছে। তারপর একজোড়া ভারি বুটের শব্দ।

'এই হট্ যাও, হট্ যাও—হটো। শালা কুত্তিকা বাচ্চা ফিন্ লাগায়া—'

ফর্র্। হাওয়ায় ছেঁড়া কাগজের আর্তনাদ আর করাতের মতো কাঠচেরাই গলার গালাগালি। পোস্টারটা ছিঁড়ে ফেলেছে পুলিসটা। তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে আরও কতগুলি ছেঁড়া পোস্টারের অবশেষ চিহ্ন। লাল, সবুজ, কালো কালির টুকরো টুকরো শব্দ—কোনোটা ভগ্নাংশ : ছাঁটাই ··· জাতীয় সরকার ··· গুলি ··· মজুর মধ্যবিত্ত। ভিড় দাঁড়িয়ে আছে—পড়ছে। জমছে।

'আরে হটো—হট্ যাও।'—

এবার লাঠি উঁচিয়েছে।

'হটো।'—

হটো। হটো। অমিয়া, চিংড়িদহ, পাহাড়, সমুদ্র! হটো!